আমাদের পরিবেশ

(তৃতীয় শ্রেণি)

सत्यमेव जयते

বিদ্যালয়-শিক্ষা-দফতর পশ্চিমবঙ্গ সরকার
পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

বিদ্যালয় শিক্ষা-দফতর। পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিকাশ ভবন, কলকাতা - ৭০০ ০৯১

পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

ডি কে ৭/১, বিধাননগর, সেক্টর -২
কলকাতা - ৭০০ ০৯১

Neither this book nor any keys, hints, comment, notes, meanings, connotations, annotations, answers and solutions by way of questions and answers or otherwise should be printed, published or sold without the prior approval in writing of the Director of School Education, West Bengal. Any person infringing this condition shall be liable to penalty under the West Bengal Nationalised Text Books Act, 1977.

প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১২
পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৩
পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৪
পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত চতুর্থ সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৫
পুনর্মুদ্রণ : ডিসেম্বর, ২০১৬
পুনর্মুদ্রণ : মার্চ, ২০১৭

মুদ্রক
ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)
কলকাতা-৭০০ ০৫৬

পর্ষদ-এর কথা

নতুন পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী তৃতীয় শ্রেণির 'আমাদের পরিবেশ' বইটি প্রকাশিত হলো। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১ সালে একটি 'বিশেষজ্ঞ কমিটি' তৈরি করেন। সেই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী 'আমাদের পরিবেশ' বইটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তকগুলি তৈরি করার ক্ষেত্রে 'জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫' এবং 'শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯' -এই দুটি নথিকে বিশেষভাবে অনুসরণ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা আর অন্বেষণ প্রক্রিয়াকে হাতেকলমে ব্যবহার করার যথেষ্ট পরিসর বইটির মধ্যে রয়েছে। শিক্ষার্থীর বাস্তব অভিজ্ঞতাকে প্রাধান্য দিয়ে কয়েকটি ভাবমূল (Theme)-কে ভিত্তি করে একদিকে যেমন বইটি রচিত, অন্যদিকে শ্রেণিকক্ষের চারদেয়ালের বাইরে যে বিশ্বপ্রকৃতির অবাধ ক্ষেত্র সেদিকেও শিক্ষার্থীর জানা-বোঝাকে সম্প্রসারিত করার প্রয়াস বইটিতে স্পষ্ট। আশা করা যায় বুনিয়াদি স্তরে শিক্ষার্থীর বিজ্ঞান, সমাজ, ইতিহাস ও ভূগোল শিখনে তৃতীয় শ্রেণির 'আমাদের পরিবেশ' বইটি যথাযথ ভূমিকা পালন করবে।

একদল নির্বাচিত শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিষয়-বিশেষজ্ঞবৃন্দ বইটি প্রণয়ন করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ জানাই। প্রখ্যাত শিল্পীবৃন্দ বিভিন্ন শ্রেণির বইগুলিকে রঙে-ছবিতে চিত্তাকর্ষক করে তুলেছেন। তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

'আমাদের পরিবেশ' বইটি শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরিত হবে। ২০১৬ শিক্ষাবর্ষে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি কোণে বইটি যাতে যথাসময়ে পৌঁছে যায়, সেই ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ এবং পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার গ্রহণ করবে। বইটির উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গের মতামত আর পরামর্শ আমরা সাদরে গ্রহণ করব।

মার্চ, ২০১৭

মানিক ভট্টাচার্য

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ভবন
ডি-কে ৭/১, সেক্টর ২
বিধাননগর, কলকাতা ৭০০০৯১

সভাপতি
পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

প্রাক্‌কথন

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১ সালে বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি 'বিশেষজ্ঞ কমিটি' গঠন করেন। এই 'বিশেষজ্ঞ কমিটি'-র ওপর দায়িত্ব ছিল বিদ্যালয়স্তরের সমস্ত পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক - এর পর্যালোচনা, পুনর্বিবেচনা এবং পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়া পরিচালনা করা। সেই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক নির্মিত হলো। আমরা এই প্রক্রিয়া শুরু করার সময় থেকেই জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫ (NCF 2005) এবং শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ (RTE 2009) এই নথি দুটিকে অনুসরণ করেছি। পাশাপাশি আমাদের সমগ্র পরিকল্পনায় আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাদর্শের রূপরেখাকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছি।

লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, '... শিখিবার কালে, বাড়িয়া উঠিবার সময় প্রকৃতির সহায়তা নিতান্তই চাই। গাছপালা, স্বচ্ছ আকাশ, মুক্তবায়ু, নির্মল জলাশয়, উদার দৃশ্য ইহারা বেঞ্চি এবং বোর্ড, পুথি এবং পরীক্ষার চেয়ে কম আবশ্যক নয়।' ('শিক্ষাসমস্যা') 'আমাদের পরিবেশ' পর্যায়ের বইগুলিতে আমরা উদার প্রকৃতির সঙ্গে পাঠ্যপুস্তকের সংযোগ তৈরি করার চেষ্টা করেছি। অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে শিক্ষার্থীরা যাতে প্রকৃতির সামনে নিয়মিত দাঁড়ায়, আমরা পাঠ্যপুস্তককে তার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছি। তৃতীয় শ্রেণি-র 'আমাদের পরিবেশ' বইটিতে একটি নির্দিষ্ট বিন্যাস রয়েছে। প্রকৃতি এবং মানবজীবনের বিভিন্ন সম্পর্ক এই বইয়ের মধ্যে বিধৃত রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে 'আমাদের পরিবেশ' পর্যায়ের বইগুলিতে আমরা পরিবেশ পরিচয়ের সূত্রে বিজ্ঞান, ভূগোল এবং ইতিহাসের প্রাথমিক ধারণাগুলিকে সন্নিবিষ্ট করেছি।

নির্বাচিত শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিষয়-বিশেষজ্ঞবৃন্দ অল্প সময়ের মধ্যে বইটি প্রস্তুত করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষার সারস্বত নিয়ামক পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। তাঁদের নির্দিষ্ট কমিটি বইটি অনুমোদন করে আমাদের বাধিত করেছেন। বিভিন্ন সময়ে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দফতর, পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন,পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার প্রভূত সহায়তা প্রদান করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ।

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. পার্থ চ্যাটার্জী প্রয়োজনীয় মতামত এবং পরামর্শ দিয়ে আমাদের বাধিত করেছেন। তাঁকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

বইটির উৎকর্ষবৃদ্ধির জন্য শিক্ষাপ্রেমী মানুষের মতামত, পরামর্শ আমরা সাদরে গ্রহণ করব।

মার্চ, ২০১৭

নিবেদিতা ভবন
পঞ্চমতল
বিধাননগর, কলকাতা ৭০০০৯১

অভীক মজুমদার

চেয়ারম্যান
'বিশেষজ্ঞ কমিটি'
বিদ্যালয় শিক্ষা দফতর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিশেষজ্ঞ কমিটি পরিচালিত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন পর্ষদ

পুস্তক নির্মাণ ও বিন্যাস

অধ্যাপক অভীক মজুমদার (চেয়ারম্যান, বিশেষজ্ঞ কমিটি)　অধ্যাপক রথীন্দ্রনাথ দে (সদস্য-সচিব, বিশেষজ্ঞ কমিটি)

অধ্যাপক রত্না চক্রবর্তী বাগচী (সচিব, পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ)

ডঃ দেবব্রত মজুমদার　ডঃ সন্দীপ রায়　অনির্বাণ মণ্ডল

পরামর্শ ও সহায়তা

অধ্যাপক এ.কে. জালালউদ্দিন	ডঃ শীলাঞ্জন ভট্টাচার্য	ডঃ দেবীপ্রসাদ দুয়ারী	অধ্যাপক সুমন রায়
অধ্যাপক মিনহাজ হোসেন	অধ্যাপক মিতা চৌধুরী	দেবাশিস মণ্ডল	সুব্রত হালদার
বন্দনা সরকার ভট্টাচার্য	ডঃ ধীমান বসু	প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী	সুব্রত গোস্বামী
পার্থপ্রতিম রায়	বিশ্বজিৎ বিশ্বাস	রুদ্রনীল ঘোষ	দেবব্রত মজুমদার
সুদীপ্ত চৌধুরী	নীলাঞ্জন দাস	ডঃ শ্যামল চক্রবর্তী	সঞ্জয় বড়ুয়া

পুস্তকসজ্জা

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : দেবাশিস রায়

প্রচ্ছদলিপি : দেবব্রত ঘোষ

সহায়তা : সুব্রত মাজী, হীরাব্রত ঘোষ, বিপ্লব মণ্ডল

শরীর ১ - ৪২

খাদ্য ৪৩ - ৮৬

পোশাক ৮৭ - ১০৮

পরিবার ১৫১ - ১৮২

আকাশ ১৮৩ - ২১৪

সম্পদ ২১৫ - ২৪১

ঘরবাড়ি ১০৯ - ১৫০

সাবধানতা ২৪২ - ২৫৬

রংবাহার ২৫৭-২৫৯

আমার পাতা ২৬০

পাঠ্যসূচি ২৬১-২৬৩

মূল্যায়নের রূপরেখা ২৬৪-২৬৮

শিখন পরামর্শ ২৬৯-২৭৮

এই পাঠ্যপুস্তক বিষয়ে কয়েকটি কথা

আমাদের শিক্ষাপ্রণালীর রোগনির্ণয় ও তার চিকিৎসা বিষয়ে ১৮৯২ সালে ‘শিক্ষার হেরফের’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন:

“ইহার প্রধান কারণ, বাল্যকাল হইতে আমাদের শিক্ষার সহিত আনন্দ নাই। ... একটা শিক্ষাপুস্তককে রীতিমতো হজম করিতে অনেকগুলি পাঠ্যপুস্তকের সাহায্য আবশ্যক। আনন্দের সহিত পড়িতে পড়িতে পড়িবার শক্তি অলক্ষিতভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে; গ্রহণশক্তি ,ধারণাশক্তি ,চিন্তাশক্তি বেশ সহজে ও স্বাভাবিক নিয়মে বললাভ করে।”

আমরা রবীন্দ্রনাথের এই রোগনির্ণয় ও চিকিৎসাবিধান মেনে এই ‘পাঠ্যপুস্তক’ তৈরি করার চেষ্টা করেছি। আমাদের আশা শিশু ‘আনন্দের সহিত’ এ-বই পড়বে। তাদের নিজেদের মধ্যে যেসব আলোচনা (কথা বলাবলি) করতে বলা হয়েছে তা ‘আনন্দের সহিত’ করবে। শ্রেণিকক্ষে অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে তাদের কোলাহল ক্রমে তাদের আনন্দময় দলগত আলোচনায় রূপান্তরিত হতে থাকবে। পাড়ায় ও অন্যদের সঙ্গেও আলোচনা করবে ‘আনন্দের সহিত’।

জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫-এ বলা হয়েছে **“Intelligent guessing must be encouraged as a valid pedagogic tool. Quite often children have an idea arising from their everyday experiences, or because of their exposure to media, but they are not quite ready to articulate it in ways that a teacher might appreciate it. It is in this ‘zone’ between what you know and what you almost know that new knowledge is constructed. Such knowledge often takes the form of skills, which are cultivated outside the school, at home or in the community. All such forms of knowledge must be respected”**

বাড়ির ও পাড়ার শিক্ষিত মানুষদের কাছে তো বটেই, অনেকসময় অনেক নিরক্ষর কাছের মানুষদের থেকেও তারা ধারনা (idea) পাবে। তার আগে ও পরে 'আনন্দের সহিত' এই বই পড়ার ফলে তাদের নতুন জ্ঞান-গঠন প্রক্রিয়া এগিয়ে যাবে। এর ফলে শুধু তাদের 'পড়িবার শক্তি অলক্ষিতভাবে বৃদ্ধি' পেতে থাকবে এমন নয়, আত্মবীক্ষণ ও পরিবেশবীক্ষণ বিষয়ে তাদের 'গ্রহণশক্তি, ধারণাশক্তি, চিন্তাশক্তি বেশ সহজে ও স্বাভাবিক নিয়মে বললাভ' করতে থাকবে।

তবে এত কিছু হঠাৎ হবে না। শিক্ষিকা ও শিক্ষক, অভিভাবিকা ও অভিভাবকদের সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতা ছাড়া এই সাফল্য অর্জন কোনোদিনই সম্ভব হবে না। তাই মুখ্যত তাঁদের উদ্দেশ্যেই এইসব কথা।

শিশুরা শ্রেণিকক্ষে কী করবে, শিক্ষিকা ও শিক্ষকরা কীভাবে তাদের সাহায্যকারী (facilitator) হয়ে উঠবেন তার উদাহরণ বইয়ের প্রতি পৃষ্ঠায় রয়েছে। বাড়ির লোক ও পাড়ার লোকদের কাছে কী সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে তার উদাহরণও রয়েছে বইয়ের অনেক পৃষ্ঠায়।

হয়ত এরপর আর শিখন-পরামর্শ দরকার হবে না। তবু আমরা জানি, এই পথে আমরা সবাই প্রথম চলতে চাইছি। এত বিস্তৃত ক্ষেত্রে এপথে চলার কোনো অভিজ্ঞতার কথা আমাদের জানা নেই। তাই কিছু শিখন-পরামর্শ বইয়ের শেষে দেওয়া হল। আপনারাও ভাববেন, জানাবেন আপনাদের পরামর্শ।

আসুন, সবাই মিলে আমরা শিশুদের শৈশব কেড়ে না নিয়ে তাকে এমন বইয়ের সঙ্গে পরিচিত করাই যা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'শিক্ষাপুস্তক' নয়, 'পাঠ্যপুস্তক'।

আমাদের পরিবেশ

আমার নাম ....

আমার মায়ের নাম ....

আমার বাবার নাম ....

আমার রোল নম্বর ....

আমাদের বিদ্যালয়ের নাম ....

আমাদের বাড়ির নম্বর ও রাস্তার নাম ....

....

আমাদের গ্রামের নাম/শহরের নাম ....

আমাদের জেলার নাম ....

রোজ বিকেলে নানা খেলা

ক্লাসে এসে দিদিমণি বললেন— কাল বিকালে কী কী খেলা হলো?

বিমল হেসে বলল— আমরা ফুটবল খেলেছি।

তিতলি বলল— জানেন দিদি, ও খুব ভালো খেলে।

— ফুটবল খেলায় পায়ের কাজ অনেক বেশি। খুব ছুটতে হয়।

হামিদ বলল— দিদি, আমরা ক্রিকেট খেলেছি।

রিনা বলল— ক্রিকেট খেলায় হাত ও পা – দুয়েরই অনেক কাজ। তাই না, দিদি?

— ব্যাট, বল করা, রান নেওয়া, ফিল্ডিং করা – সবেতেই হাত ও পায়ের কাজ।

বীণা বলল— আমরা কাল এক্কাদোক্কা খেলেছি। এক পায়ে লাফাতে গেলে পায়ের কাজ আরো বেশি হয়?

— পায়ের পাতা, গোড়ালি, হাঁটু – সবেরই কাজ হয়।

আমিনা বলল— তবে লুকোচুরি খেলতেও খুব ছুটতে হয়।

সাবিনা বলল— আমি রোজ স্কিপিং করি। তাতেও পুরো শরীরের কাজ হয়?

— নিশ্চয়ই। স্কিপিং-এ আঙুল, কবজি, কনুই, কাঁধ – সবেরই অনেক কাজ হয়। তাছাড়া পায়ের কাজ তো আছেই।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

নীচে হাত আর পায়ের নানা অংশের ছবি আছে। সেগুলো কোনটা কী কাজ করে? ছবির পাশে লেখো :

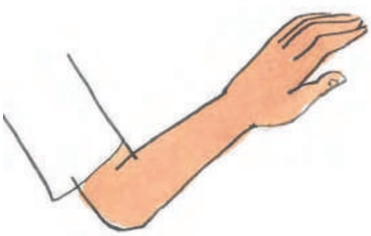

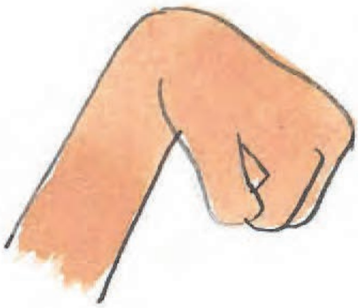

শরীর

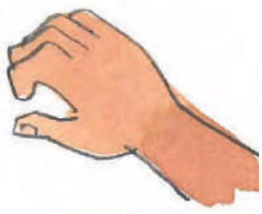

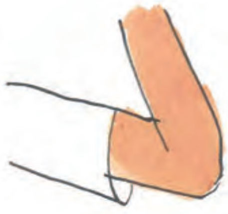

ঠিকঠাক খেলা আর ঠিকমতো শোনা

রিনা বলল--- দিদি, গতকাল আমরা কিন্তু কাবাডি খেলেছি।

আমিনা বলল— ওর দম খুব। ও যে দলে থাকে তারাই জেতে।

সীমা বলল— ও মিন মিন করে কবাডি কবাডি বলে। শোনা যায় না। দম নিয়ে নিচ্ছে কিনা বোঝা যায় না।

বিশু হেসে বলল— এই নিয়ে খুব ঝগড়া হয়। সীমা বলে, তুই দম নিয়েছিস। রিনা মানে না।

রিনা বলল— অন্যরা তো বলে না। ও কম শোনে। তাহলে আমি কী করব?

দিদিমণি জানতে চাইলেন— কী কারণে কানে শোনার অসুবিধে হয় জানো?

দিলীপ বলল— কান বুজে গেলে শুনতে অসুবিধে হয়।

— কানে ময়লা জমার কথা বলছ তো?

নিশা বলল— হ্যাঁ দিদি। কানে খোল জমে কান বুজে যায়।

— ঠিক বলেছ। কান পরিষ্কার করতে হয়। তবে সাবধানে করতে হয়। কানের ভিতর একটা পাতলা পর্দা আছে।

— কোথায়? দেখা যায় না তো!

— একটু ভিতরে আছে। তাতে আঘাত লাগলে খুব মুশকিল।

দিলীপ বলল— আমার দাদু আমার কান পরিষ্কার করে দেয়।

— ভালো করেন। কানের ময়লা পরিষ্কার করায় বড়োদের সাহায্য নেওয়াই ভালো।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

কীভাবে কী করো? কী করলে কী হয়? নীচে লেখো :

কী দিয়ে আমরা শ্বাস নিই?	
শ্বাস নিলে শরীরের কোন অংশ ফুলে ওঠে?	
শ্বাস নিলে শরীরের কোন অংশ ফুলে ওঠে?	
কথা বলার সময় শরীরের কোন অঙ্গ কাজ করে?	
কান ছাড়া মুখের আর কোথায় কোথায় নোংরা জমে?	

গা, হাত, পায়ের যত্ন

রবীন বলল— দিদি, খেলতে খেলতে আঙুলের নখের নীচেও খুব নোংরা জমে।

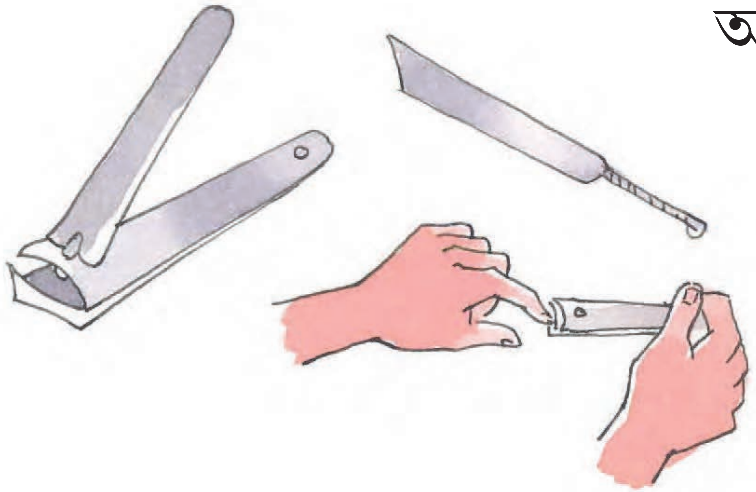

আমিনা বলল--- নখ পরিষ্কার করা সহজ। প্রথমে নেল-কাটার দিয়ে নখ কাটবি। তারপর সাবান দিয়ে ধুয়ে নিবি।

দিদিমণি বললেন— ঠিক বলেছ। সাবান লাগাবে। তারপর নখগুলো একটু ঘষে নেবে।

রিনা বলল— দিদি, নেল-কাটার কথাটা ইংরাজি তাই না?

— হ্যাঁ। নেল তো নখ। আর, যা দিয়ে কাটা হয় সেটা কাটার।

ঋজু বলল— ব্লেড দিয়েও নখ কাটা যায়।

রিনা বলল— তা যায়। তবে খুব সাবধানে কাটতে হয়। নইলে আঙুল কেটে যেতে পারে। আমার ঠাকুরদা নরুন দিয়ে নখ কাটে।

— আচ্ছা, কান আর নখ ছাড়া গায়ের আর কোথায় নোংরা জমে?

অসীম বলল— হাতে, পায়ে। গায়ের চামড়ার যেখানেই ভাঁজ, সেখানেই নোংরা জমে।

— যেখানে চোখ যায় না, সেখানেও নোংরা জমে। পিঠে, ঘাড়ে, কানের পিছনে।

দিলীপ বলল— কনুইতে জমে, পায়ের পাতায়ও নোংরা জমে।

— শীতকালে পায়ের পাতা নোংরা হলে খুব মুশকিল। পায়ের চামড়া ফেটে যায়।

হেনা বলল— গোড়ালিতেও নোংরা জমে। শীতকালে ফেটে যায়।

— সাবান দিয়ে ওই জায়গাগুলো পরিষ্কার করতে হয়।

দীপিকা বলল— সাবান মাখার পর ধুতে হয়। তারপর

ভিজে চামড়া হাত দিয়ে ঘষতে হয়। তাহলেই চামড়া পরিষ্কার হয়ে যায়। জুলেখা বলল— তারপর একটু তেল মাখলে আরো ভালো হয়।

— অনেক কিছুই তোমরা জানো দেখছি। সবাই নিয়মিত মাথা, গা-হাত-পা পরিষ্কার করবে। নখ বড়ো হলে কাটবে।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

নখ, মাথা, গা-হাত-পা পরিষ্কার করতে গিয়ে কী কী সমস্যা দেখেছ? নীচে লেখো :

বিষয়	কী সমস্যা হয়েছে	কীভাবে তা মিটেছে

সকালবেলা উঠে মোরা
দাঁতটি মাজি ভাই

পরের দিন। দিদিমণি ক্লাসে আসতেই রিহান বলল — দিদি, জিভেও তো খুব নোংরা জমে।

দিদিমণি বললেন— হ্যাঁ, সে তো জমেই। মুখ ধোও তো? তখন জিভছোলা দিয়ে জিভটা ঘসে নেবে। তারপর কুলকুচি করবে। জিভ পরিষ্কার হয়ে যাবে।

এমিলি বলল — দাঁতেও নোংরা জমে। মুখে গন্ধ হয়। তাইতো রোজ দাঁত মাজি।

— তবে দাঁত মাজারও নিয়ম আছে।

সবাই অবাক! দাঁত মাজার আবার নিয়ম!

— নীচের দাঁতে তলা থেকে উপরে ব্রাশ টানবে। আর উপরের দাঁতে উপর থেকে নীচে।

দিলীপ বলল — দিদি, চোখে আর নাকেও নোংরা জমে।

— নাক-চোখও পরিষ্কার করতে হয়।

পিকু বলল — নোংরাগুলো শক্ত হয়ে জমে গেলে একটু জলে ভেজালেই নরম হয়ে যায়। পরিষ্কার করা সহজ হয়। তাই না দিদি?

— এইতো বেশ জানো। সবাই রোজ সকালে দাঁত, জিভ, নাক, চোখ, মুখ সব পরিষ্কার করবে।

নাক, কান, চোখ, জিভ, চামড়া মিলে মিশে পাঁচজন আমরা

আমিনার নানা কী যেন ভাবছিলেন। আমিনা নানার কনুইয়ের কাছে পেনসিল দিয়ে ঠেলল। নানা আমিনার দিকে তাকালেন। বললেন — কোথায় পেনসিল ছোঁয়ালে বোঝা যায় বলো দেখি?

— চামড়ায়।

--- গায়ের চামড়া যেখানে পাতলা সেখানে বেশি করে বোঝা যায়।

— সে তো সবাই জানে।

নানা হেসে বললেন— ধরো যদি কাঠিগজা দিয়ে গায়ে চাপ দাও? তাহলে ব্যথা লাগবে। কিন্তু গজাটা জিভে ছুঁলেই মিষ্টি! আবার, দিনের আলোয় চোখ বুজে থাকো। কিছু দেখতে পাবে না। চোখে আলো গেলে তবেই দেখতে পাবে। তেমনি, কানটা বন্ধ করে রাখো। ডাকলে শুনতে পাবে না। নাকটা ভালো করে চেপে রাখো। গন্ধ পাবে না।

আমিনা পরদিন স্কুলে এসব বলল। কাঠিগজা নিয়ে ওর নানার কথা শুনে বন্ধুরা খুব মজা পেল।

দিদিমণি বললেন— চোখ, কান, নাক, জিভ আর চামড়া, এই পাঁচটা অঙ্গকে বলে ইন্দ্রিয়। পাঁচটা, তাই পঞ্চেন্দ্রিয়।

তিয়ান বলল— গলা শুনেও কে ডাকছে বোঝা যায়।

রবীন বলল— খুব চেনা লোক হলে তবেই বোঝা যায়।

— হ্যাঁ। দেখে চেনা, আর গলা শুনে চেনা। দুটো আলাদা কাজ। যারা চোখে ভালো দেখে না, তারা কানটা খুব

কাজে লাগায়।

হীরা বলল— আমার ঠাকুমা চোখে দেখেন না। গলা শুনলে আমাদের চিনতে পারেন। ছুঁয়েও চিনতে পারেন।

— হ্যাঁ। একটা ইন্দ্রিয় অকেজো হলে অন্যগুলো আরো সজাগ হয়ে যায়। তাই তোমার ঠাকুমা না দেখেও চিনতে পারেন।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

১। ইন্দ্রিয়গুলোর কী কী কাজ নীচে লেখো :

ইন্দ্রিয়ের নাম	ইন্দ্রিয়ের কাজ
জিভ	খাবারের স্বাদ নেওয়া। নানারকম স্বাদের তফাত বোঝা।

২। নীচে একজন মানুষের ছবি আঁকো। মাথা, মুখ, গলা, হাত, পা ও আঙুল দেখাও। কোন অঙ্গ কী কাজ করে? অঙ্গগুলো কীভাবে পরিষ্কার করবে লেখো :

মানুষের ছবি ও নানা অঙ্গের নাম	ওই অঙ্গ দিয়ে আমরা কী করি	ওই অঙ্গগুলো কীভাবে পরিষ্কার করবে

কানামাছি ভোঁ ভোঁ যাকে পাবি তাকে ছোঁ

কানামাছি খেলায় সবাই কানামাছিকে ঘিরে ছোটে আর বলে— কানামাছি ভোঁ ভোঁ / যাকে পাবি তাকে ছোঁ!

সেদিন দিদিমিণি খেলার নতুন নিয়ম ঠিক করে দিলেন। একটা দলে ছ-জন। একজন

কানামাছি। একজন রেফারি। অন্য চারজন একটু দূরে গিয়ে দাঁড়াবে। ছুটবে না। প্রত্যেকে চারবার করে বলবে : কানামাছি ভোঁ ভোঁ / যাকে পাবি তাকে ছোঁ! কানামাছি শুনবে। আন্দাজ করবে, শব্দ কোথা থেকে আসছে। তারপর খুঁজতে যাবে। এক মিনিটের মধ্যে ছুঁতে হবে। না পারলে অন্যরা আবার সরে যাবে। আবার চারবার করে কানামাছি ভোঁ ভোঁ বলবে।

এভাবে খানিকক্ষণ খেলা হলো। নতুন নিয়ম। খুব মজা। একটু পরে তিয়ান বলল— আর একটা নিয়ম হতে পারে। প্রথমে সবাই ঘুরতে ঘুরতে কানামাছি ভোঁ ভোঁ বলবে। তারপর রেফারি একজনকে বলতে বলবে। সে বলবে। কানামাছি গলার স্বর শুনে বলবে কার গলা।

দিদিমণি বললেন— বাঃ! এও তো খুব মজার নিয়ম।

রবীন মোটা গলায় বলল— আমি অন্যরকম গলা করে বলব।

প্রকাশ বলল— দেখিস, তবু আমি ঠিক বুঝে যাব।

সীমা বলল— তাহলে প্রকাশই প্রথমে কানামাছি হোক। প্রকাশ কানামাছি হলো। তিয়ানের নিয়মে আবার খেলা শুরু হলো।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

কানামাছি খেলা তো হলো। এবার নীচে লেখো :

কানামাছি খেলার এই দুই নিয়মে কোন ইন্দ্রিয়টা চোখের বদলে কাজ করে?	
আর কী নতুন নিয়মে কানামাছি খেলা হতে পারে?	
যে নিয়মের কথা লিখেছ তাতে কোন ইন্দ্রিয়টা চোখের বদলে কাজ করে?	

চোখের মতো বন্ধু নেই

ক্লাসে এসে দিদিমণি বললেন— রিনা, কাল স্কুলে এলে না?

রিনা বলল— পেটের অসুখ হয়েছিল।

— আজকাল খুব এটা-সেটা খাচ্ছ। পেটের আর দোষ কোথায়? কথার মাঝে দিদি খেয়াল করলেন পিন্টু মাথা নীচু করে আছে। দিদি ডাকলেন। পিন্টু বলল— খুব মাথাব্যথা হচ্ছে দিদি। কদিন ধরে পড়তে গেলেই এমন হচ্ছে।

দিদি ওকে একটা বই পড়তে দিলেন। পিন্টু চোখের খুব কাছে বইটা ধরল। তবে পড়তে পারল।

দিদি বুঝলেন ও দূরের জিনিস খুব ভালো দেখতে পায় না। ওকে বললেন— তোমার বাবাকে কালই একবার স্কুলে আসতে বলবে। তোমায় চোখের ডাক্তার দেখাতে

হবে। হয়তো এজন্যই তোমার মাথাব্যথা করে। তোমাদের কি আর কারও এমন সমস্যা আছে? তাহলে হাত তোল।

বেশ কিছু হাত এদিক ওদিক থেকে উঠে পড়ল।

দিদিমনি বললেন --- ঠিকমতো দেখতে না পেলে এই সুন্দর পৃথিবীকে জানব কেমন করে?

রিনা বলল — ঠিকমতো দেখতে না পেলে আমাদের নানাকিছু শিখতেও অসুবিধা হবে।

— ঠিক বলেছ। চোখ আলো চিনে আমাদের দেখতে সাহায্য করে। তাই চোখের যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। না নিলে খুব অল্প বয়সেই চশমা নেওয়ার প্রয়োজন হয়। এই দেখো না, আমি আবার কাছের জিনিস খুব ভালো দেখি না। তাই আমাকেও চশমা নিতে হয়েছে।

পল্টু বলল — আমার মাসতুতো ভাই রং চিনতে পারে না। তাই তার চিকিৎসা চলছে।

— আমাদের চোখে এমন কিছু জিনিস আছে যা আমাদের রং চিনতে সাহায্য করে। তোমার ভাইয়ের চোখে সেগুলো হয়তো ঠিকমতো কাজ করছে না।

ইমরান বলল — আমার বন্ধু তপন রাতের বেলায় ভালো দেখতে পায় না।

— তপনের মনে হয় রাতকানা রোগ হয়েছে। আসলে কি জানো, চোখ আমাদের সবকিছু দেখতে শেখায়। চিনতে শেখায়। শিখতে সাহায্য করে। তাই চোখের যত্ন নেওয়া খুব দরকার।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

তোমাদের কার কী অসুখ হয়েছিল? সেই অসুখে কোথায় কী কষ্ট হয়েছিল? কোন অসুখে কী কষ্ট হয় বাড়িতে বড়োদের কাছে জেনে নাও। তারপর নীচে লেখো :

অসুখের নাম	কোথায় কষ্ট ও কী কষ্ট

ইন্দ্রিয়দের সাড়া, সহজে বুঝতে পারা

মরিয়ম একটা গোলাপ এনেছে। ডালের ডগায় একটা ফুল, কয়েকটা পাতা। ডালের গায়ে ছোট্ট দুটো কাঁটাও আছে। জিয়ানা ফুলটা নিতে হাত বাড়াল। ধরার পরই আঃ! করে ডালটা ছেড়ে দিল। দিলীপ আর হিমু দেখছিল। দিলীপ এগিয়ে এসে বলল— কাঁটা ফুটেছে? নাকি নাকে পোকা ঢুকল? জিয়ানা তখন আঙুল দেখছে। রক্ত বেরিয়েছে কিনা।

হিমু বলল— কাঁটাই ফুটেছে। কাঁটাটা ফুটতেই ছেড়ে দিয়েছে। তাই রক্ত বেরোয়নি।

জিয়ানার চোখে জল এসে গেছে। রক্ত বেরোয়নি, কিন্তু লেগেছে।

মরিয়ম ফুলটা জিয়ানার নাকের কাছে এগিয়ে ধরল। জিয়ানা দু-বার বড়ো করে শ্বাস টানল। কী দারুণ গন্ধ! হেসে বলল— যেমনি কাঁটার খোঁচা, তেমনি ভালো গন্ধ! দিদিমণি একটু দূর থেকে সবই দেখছিলেন। কাছে এসে

জিয়ানার আঙুলটা দেখলেন। হেসে বললেন— জিয়ানা, ব্যথা টের পেলে চামড়ায়। আর গন্ধ নিলে নাক দিয়ে। তাহলে নাক আর চামড়ার কাজ একসঙ্গে জেনে গেলে!

জিয়ানা ম্লান হেসে বলল— হ্যাঁ দিদি।

রিক্তা বলল— কিন্তু দিদি, কাঁটা ফুটল আঙুলে। তাহলে ওর চোখে জল এল কেন?

— তোমাদের এক বন্ধুর আঘাত লাগলে অন্যজনের কষ্ট হয় না? ওর একটা ইন্দ্রিয়ে আঘাত লাগল। অন্য একটা ইন্দ্রিয়ও তাতে কষ্ট পেল। চামড়াও যে একটা ইন্দ্রিয়।

দিলীপ বলল— দিদি, কেউ বকলেও চোখে জল আসে। কিন্তু, তখন তো কোনো ইন্দ্রিয়ে লাগে না?

— তখন ইন্দ্রিয়ে নয়, মনে কষ্ট হয়।

তিতলি বলল— ভয় লাগলেও কান্না পায়।

— হ্যাঁ। চারপাশের প্রভাবে ইন্দ্রিয়গুলো সাড়া দেয়। হঠাৎ অনেক আলো এসে পড়লে চোখ বুজে যায়। গরমে চামড়া থেকে দরদর করে ঘাম বেরোয়। ঠান্ডায় চামড়া ফেটে যায়। বাজ পড়ার শব্দে কানে তালা ধরে যায়। খুব ঝাল লাগলে জিভ জ্বালা করে। নাকে কিছু ঢুকে গেলেও নাক সুড়সুড় করে। আসলে ইন্দ্রিয়গুলো সবাই খুব সজাগ।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

চারপাশের প্রভাবে বিভিন্ন ইন্দ্রিয় ও মন কীভাবে সাড়া দেয় তা নীচে লেখো :

চারপাশের প্রভাব	ইন্দ্রিয়ের ও মনের সাড়া
কারোর বকুনি	চোখে জল আসা। কান্না পাওয়া। মনে দুঃখ হওয়া। রাগ হওয়া।
বাজ পড়ার শব্দ	

সাঁতরে চলা এপার ওপার

পাড়ায় একটা বড়ো পুকুর। নিজের নিজের বাড়ি থেকে হেঁটে এল এক দল ছেলেমেয়ে। দীপক, অরুণ, নীলিমা, জন, সোনাই, টিকাই, ডমরু, হাসান, বিল্টু, সাজিদা আরো অনেকে। কারো বা জলে নামতে ভয়। এখনও ভালো করে সাঁতার শেখেনি। কেউ আবার খুব ভালো সাঁতার জানে। স্কুলে সাঁতার প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পেয়েছে। টিকাই জলে নামার আগে ব্যায়াম শুরু করল।

জন বলল — তুই রোজ ব্যায়াম করে জলে নামিস। কেন বলত?

টিকাই বলল — আগে একটু ব্যায়াম করে নিলে ভালো হয়।

— কী ভালো ?

— আগে হাত-পা টান টান করতে হয়। একটু তাড়াতাড়ি শ্বাস নিতে হয়, ছাড়তে হয়। তারপর সাঁতার কাটতে নামলে ভালো সাঁতার কাটা যায়।

এদিকে অনেকে জলে নেমে গেছে। সাঁতরাতে শুরু করেছে। একবার ডান হাতটা তুলছে, একবার বাঁ হাতটা।

স্কুল বসতে তখনও দেড় ঘণ্টা দেরি। স্কুলের বড়দিমণি পুকুরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি ওদের দেখতে দেখতে গেলেন। ওরা কেউ তা জানল না।

দুপুরের খাওয়ার পর বড়দির ক্লাস। ক্লাসে এসে বড়দি বললেন— কে কে সাঁতার জানো ? হাত তোলো।

অনেকে হাত তুলল। বড়দি দেখলেন তিনজন হাত তোলেনি। মৌমিতা, সফিকুল আর অ্যালিস।

দীপক আর সোনাই পাশাপাশি বসেছিল। ওদের দিকে চেয়ে বললেন--- তোমরা মৌমিতা, সফিকুল আর অ্যালিসকে সাঁতার শিখিয়ে দেবে।

মৌমিতাকে বললেন--- সাজিদা শিখছে। তোমরাও শিখে নেবে।

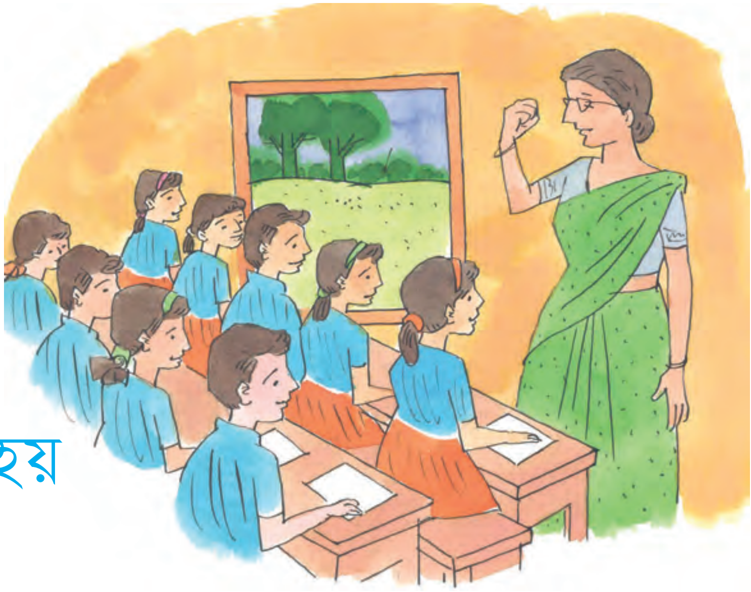

মৌমিতা ঘাড় নাড়ল। এবার দিদি বললেন— সাঁতার কাটলে কী হয় বলত?

ডমরু বলল— খুব ভালো ব্যায়াম হয়।

— ঠিক বলেছ। আর একটু বুঝিয়ে বলো।

ডমরু বলল— হাত নাড়া হয়। পা নাড়া হয়। বুকে পিঠে জলের ধাক্কা লাগে। কোথাও ব্যথা-বেদনা হতে পারে না।

দিদি এবার নিজের কনুইয়ের কাছটা ভাঁজ করে দেখালেন। বললেন— ঠিক বলেছ। আবার দেখো, কবজির কাছে দুটো হাড়ের জয়েন্ট বা জোড়। এইরকম সারা শরীরে অনেক জোড় আছে। সাঁতার কাটলে ওইসব জোড়ের নাড়াচাড়া হয়। জায়গাগুলো সুস্থ থাকে।

অ্যালিস বলল— অন্য ব্যায়াম করলে হয় না?

— হয়। সব ব্যায়ামেই শরীরের উপকার। যেমন ধরো পিটি করা। তুমি দু-হাত উপরে তুলেছ। তাতে হাত আর কাঁধের জোড়ের নাড়াচাড়া হচ্ছে।

টিকাই বলল— কিন্তু সাঁতারে একসঙ্গে সব জোড়ের উপকার।

— ঠিক। আরো একটা কথা আছে। সাঁতার কাটলে বারবার লম্বা শ্বাস নিতে হয়। তাতেও শরীরের খুব উপকার হয়।

সফিকুল বলল— ফুটবল খেলার সময় খুব ছুটতে হয়। হাঁফিয়ে যাই। তখন লম্বা শ্বাস নিই।

মৌমিতা বলল— দিদি, কাবাডি খেললেও তাই হয়। খুব হাঁফিয়ে যাই।

— তাও ঠিক। ফুটবল, কাবাডি, ব্যাডমিন্টন এসব খেলাও ভালো। শরীরের অনেক জায়গার ব্যায়াম হয়।

টিকাই বলল— সাঁতারে একসঙ্গে সব জায়গার ব্যায়াম হয়।

— হ্যাঁ। কম সময়ে হয়। আরো ভালো হয়। তাই সাঁতার কাটা খুব ভালো। তবে সাঁতার না জেনে গভীর জলে নামা ঠিক নয়।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

শরীরের কোথায় কোথায় হাড়ের জোড় আছে নীচে এঁকে দেখাও। হাঁটায়, বিভিন্ন খেলায় আর সাঁতার কাটায় শরীরের কোন কোন জায়গার ব্যায়াম হয় তা নীচে লেখো :

শরীরের একটা ছবি আঁকো। কোথায় কোথায় হাড়ের জোড় আছে তা ছবিতে ○ চিহ্ন দিয়ে দেখাও।	হাঁটায়, বিভিন্ন খেলা করায় আর সাঁতার কাটায় শরীরের কোন কোন জায়গার ব্যায়াম হয় তা লেখো।
	হাঁটা : ফুটবল খেলা : কবাডি খেলা : ক্রিকেট (বল করা) : ক্রিকেট (ব্যাট করা) : ক্রিকেট (ফিল্ডিং করা) : স্কিপিং করা : ব্যাডমিন্টন খেলা : সাঁতার কাটা :

চার পাশ, বারো মাস বন্ধুতে ভরা

রেহানা আর রিহান স্কুল থেকে ফিরে হাঁসদের ডেকে রোজ বাড়ি নিয়ে যায়। হাঁসগুলো সেই সকালে কুঁড়োমাখা খেয়ে জলে নামে। তারপর সারাদিন জলে থাকে।

রবিলাল আর পিরু রোজ মাঠে যায়। খেলার শেষে মাঠ থেকে গোরু আর ছাগল বাড়িতে আনে। মৌটুসির বিকেল কাটে তার বিড়ালের কাণ্ডকারখানা দেখে। রিমলির চড়াই আছে এক ঝাঁক। সকাল হলেই তারা চলে আসে। জানালার পাশে। রিমলি তাদের ধান খাওয়াবে। বেশি নয়। দু-মুঠো ধানেই ওদের হয়ে যায়। ধান ছড়িয়ে দিয়ে রিমলি মুখ ধুতে যায়।

টিকলুর একটা কুকুর আছে। টুনকির আছে শালিখ। টুনকি তাদের জন্য কেঁচো খুঁজে রাখে। ওরা এলে খাওয়াবে।

কুট্টুসের নজর টিকটিকি আর গিরগিটির দিকে। টিকটিকিরা ঘরের পোকা খায়। গিরগিটিরা গাছে গাছে ঘোরে। কেবলই রং বদলায়। কুট্টুস অবাক হয়ে দেখে।

টিপাই ফড়িং দেখে বেড়ায়। নানারকম ফড়িং। কেউ লাফায়। কেউ বা ওড়ে। তিন্নি প্রজাপতি দেখতে এ বাগান, সে বাগানে ঘোরে। রিন্টুরও শখ নানারকম প্রজাপতি দেখা। ইতু মাছেদের খাওয়ায়। নিজে খাওয়ার সময় পাতে একটু ভাত রেখে দেয়। সেগুলো নিয়ে চলে আসে পুকুর ঘাটে। জলে ছুঁড়ে দিলেই এক ঝাঁক মাছ চলে আসে।

একদিন এসব নিয়ে কথা হচ্ছিল ক্লাসে। সবার কথা শুনলেন দিদিমণি। তারপর বললেন - বাঃ! তোমরা তো বেশ খেয়াল করে দেখেছ! এবার যে যাকে বেশি চেনো তার কথা অন্য বন্ধুদের বলো।

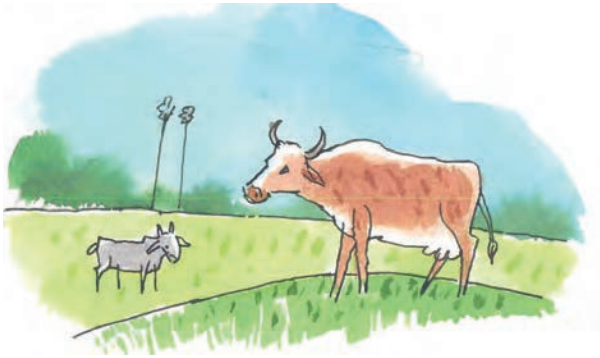

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

আগের পাতায় যাদের কথা হলো তাদের কী কী অঙ্গ আছে? ক-টা, কেমন? নীচে লেখো :

অঙ্গের নাম	গোরু	শালিখ/ কাক	টিকটিকি/ গিরগিটি	প্রজাপতি/ ফড়িং
পা	আছে / চারটে, বড়ো বড়ো			
নখ	আছে/ নাম: খুর ভোঁতা			
লোম	আছে/গা ভরতি নানা রং			
দাঁত	আছে/ ভোঁতা			
ডানা	নেই			
শিং	আছে/ দুটো শক্ত শক্ত			

অঙ্গের নাম	গোরু	শালিখ/ কাক	টিকটিকি/ গিরগিটি	প্রজাপতি/ ফড়িং
চোখ	আছে / দুটো বড়ো বড়ো			
পালক	নেই			

লাফাতে পারে কোন কোন প্রাণী	
উড়তে পারে কোন কোন প্রাণী	

মিল বেশি, পার্থক্য কম, এমন প্রাণীদের দল করো। একটা/দুটো করে নাম লেখা আছে, আরও নাম লেখো:

গোরু, ছাগল	চড়াই,	টিকটিকি,	কাতলা,	প্রজাপতি,

কাঠবিড়ালি, কাঠবিড়ালি পেয়ারা তুমি খাও

সাইনা পেয়ারা গাছের দিকে দেখিয়ে বলল— ওই দেখ আমার গুট্টু আর গুট্টি! ওরা আমার খুব প্রিয় বন্ধু। রোজ দেখা করতে আসে।

মিন্টু দেখল একটা কাঠবিড়ালি হাতে পেয়ারা ধরে খাচ্ছে। আর একটা দৌড়ে যাচ্ছে।

সাইনা বলল--- দেখছিস! আমাদের কাঠবিড়ালির হাত-পা আছে!

মিন্টু বলল— সত্যি? কাঠবিড়ালির হাত-পা থাকে?

সাইনা বড়োদের মতো করে বলল— দেখছিস না, গুটি কেমন চার পায়ে ছুটছে! ছোটার সময় সবগুলোই পা। আর গুট্টু কেমন দু-হাতে খাচ্ছে! খাওয়ার সময় সামনের দুটো পা হাত হয়ে যায়। হি হি!

— আমিও দেখেছি এরকম। চিড়িয়াখানায়। গিবন। শিম্পাঞ্জি।

— হনুমান দেখিসনি? সেও তো ওইরকমই।

— নারে। হনুমানের চেয়েও খাড়া দাঁড়ায় শিম্পাঞ্জি। প্রায় মানুষের মতো। যারা একটু সামনে ঝুঁকে দাঁড়ায় তাদের মতো। হাতে ধরে খায়। ঠিক যেন মানুষ!

— দু-পায়ে হাঁটে?

— না! হাঁটার সময় হাতগুলো সামনের পা হয়ে যায়।

— তাহলেও সুবিধে।

মিন্টু বুঝতে পারল না। বলল— কার সুবিধে? কী সুবিধে?

সাইনা বলল--- শিম্পাঞ্জিদের সুবিধে। কুকুর-ছাগলরা কোনো কিছুই হাতে ধরে খেতে পারে না। গায়ে কিছু কামড়ালে তা ছাড়াতে পারে না। গা ঝাড়াঝাড়ি করে।

এবার মিন্টু বুঝল। বলল— দুটো পা আর দুটো হাতের অনেক সুবিধে। শিম্পাঞ্জিরা গাছে উঠতে পারে। হাত দিয়ে গাছের ফল ছিঁড়ে তা ছুঁড়ে মারতেও পারে।

পরের দিন সাইনা মিন্টুকে ওদের স্কুলে নিয়ে গেল। দিদিমণিকে বলল— আমার মামাতো ভাই। কলকাতায় থাকে। জানেন দিদি, ও চিড়িয়াখানায় শিম্পাঞ্জি দেখেছে!

দিদিমণি বললেন— বাঃ। তাহলে আজ আমরা মিন্টুর কাছে শিম্পাঞ্জির কথা শুনি। চিড়িয়াখানার কথাও শুনব।

সবাই শিম্পাঞ্জি, চিড়িয়াখানার গল্প শুনল। সাইনার কাঠবিড়ালিদের কথাও উঠল। দিদি বললেন— হাত থাকার কত সুবিধে তা জানা হয়ে গেল।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

মানুষের চার পায়ের বদলে দু-পা আর দু-হাত। তাতে কিছু কিছু কাজ করতে মানুষের কি কি সুবিধে হয়? নীচে লেখো:

খেলা	
খাওয়া	
ঘুমানো	
চাষ করা	
মাছ ধরা	
রান্না করা	

মানুষের মতো আরো যারা

সকালবেলা। ঘুম থেকে উঠেই হীরামতি দেখল একটা নীল পাখি। জানালার বাইরে গাছে বসে আছে। ও পাখিটাকে ডাকল। পাখিটা যদি ওর জানালায় এসে বসে! কিন্তু পাখিটা ওর দিকে তাকালই না। উড়ে গেল। হীরামতি ভাবল, আমাদের যেমন হাত, পাখির তেমনি

ডানা। ওরাও যেন ডানা দুটো মেলে হাওয়ায় সাঁতার কাটে। ও মনে মনে ঠিক করল, আজ বন্ধুদের পাখিটার কথা বলবে।

মাছদের দেখে টিকাই ভাবে, ওদের কী মজা! যতক্ষণ খুশি জলে থাকতে পারে। কী করে পারে? ওদের কী আছে? আমাদের কী নেই? আমারও যদি তা থাকত! আমিও খালি সাঁতরে যেতাম।

স্কুলে যাওয়ার পথে ওরা এসব কথা বলাবলি করছিল। মানুষের কী কী আছে। অন্য জীবজন্তুদের কার কী আছে।

লাবণ্য বলল— মানুষ পাখির মতো উড়তে পারে না। কিন্তু উড়ে যাওয়ার জন্য উড়োজাহাজ বানিয়েছে।

ইসমাইল বলল— জানিস তো, মানুষ ডুবোজাহাজও বানিয়েছে। জলের অনেক নীচ দিয়ে বহু দূর যেতে পারে।

সাইনা বলল— মানুষের বুদ্ধি খুব। মানুষের সঙ্গে অন্য জীবজন্তুর আসল তফাত ওটাই।

ডমরু বলল— হনুমানেরও বেশ বুদ্ধি। অনেক কিছু মনে রাখে।

সাইনা বলল— শিম্পাঞ্জির বুদ্ধি আরও বেশি হতে পারে।

সব শুনে দিদিমণি বললেন— বাঃ। তোমরা বেশ ভেবেছ তো! যাদের চেনো তাদের কথাই ভাবো। কাক, অন্যান্য পাখি, বাঁদর, হাতি, কুকুর, বিড়াল কার বেশি বুদ্ধি। কার অন্য কী সুবিধে আছে।

দলে করি,বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

যাদের কথা বললে, ভাবলে তাদের সঙ্গে কোথায় কোথায় মানুষের মিল ও অমিল আছে তা নীচে লেখো :

যাদের সঙ্গে মানুষের বেশি মিল তাদের নাম	কী কী বিষয়েতারা প্রায় মানুষের মতো	কী কী বিষয়ে তাদের সঙ্গে মানুষের কিছুটা অমিল আছে
শিম্পাঞ্জি		
গিবন		
গোরিলা		
ওরাংওটাং		

জিভের জলের রহস্য

দুপুরের খাওয়া হয়ে গেছে। চার বন্ধু মাঠে দাঁড়িয়ে গল্প করছে। ইতু এক মুঠো পাকা কুল এনেছে। হলুদ রং। কোনোটা আবার লালচে। গোল গোল। কুল দেখেই মৌমিতার জিভে জল এল। ভাবল, কাঁচা আম কাটা দেখলেও জিভে জল আসে। তেঁতুল দেখলেও আসে। লোকে ফুচকা খাচ্ছে দেখলেও

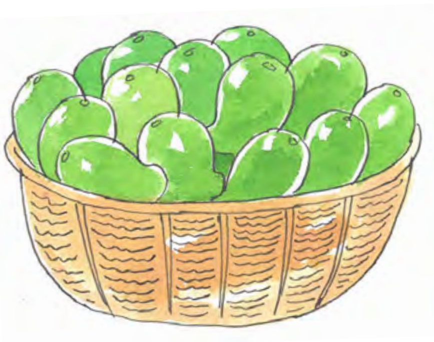

আসে। ফুচকার জন্য, নাকি তেঁতুল জলের টকের কথা ভেবে? কোনটার জন্য জিভে জল আসে?

দিদিমণি ক্লাসে ঢুকলেন। ইতু বলল—দিদি, কুল খাবেন?

দিদিমণি বললেন— বন্ধুদের দিয়েছ?

ইতু কিছু বলার আগেই মৌমিতা বলল— আচ্ছা দিদি, টক দেখলেই কি জিভে জল আসে?

দিদি কী বলবেন তা ভাবছিলেন। তা দেখে তপন বলল— দিদি, রসগোল্লা দেখলেও আমার জিভে জল আসে।

ডমরু বলল— আমার তো মাংস দেখলেও জিভে জল আসে।

এবার দিদি বললেন— ঝাল নোনতা চানাচুর দেখলে?

এমিলি বলল— তাতেও আসে।

দিদি হেসে বললেন— আসলে জিভের ওই জলকে বলে মুখের লালা। খাবার হজম করার কাজে লাগে। খানিকক্ষণ পর পর শরীর খাবার চায়। তখন খাবার দেখলেই জিভে জল আসে। পছন্দসই খাবার দেখলে এটা বেশি হয়।

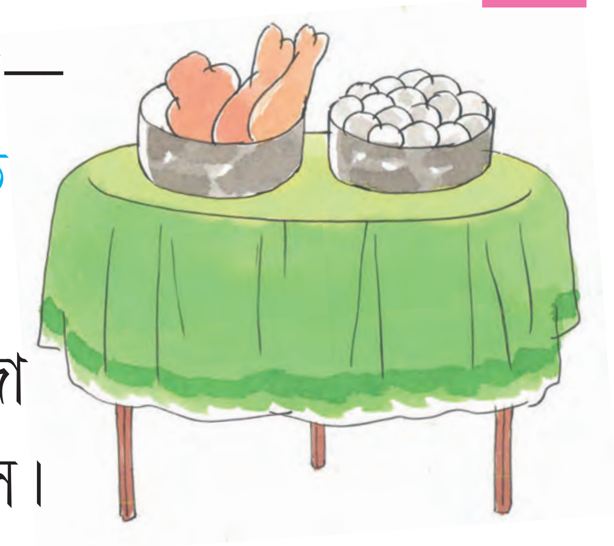

তারপর একটু থেমে বললেন—

তেতো দেখে কারোর জিভে জল আসে?

কালু বলল— নিম-বেগুন ভাজা দেখলে আমার জিভে জল আসে।

— বেশ। তাহলে কী কী স্বাদের খাবারের কথা হলো?

পিকু বলল— টক, মিষ্টি, ঝাল, নোনতা, তেতো।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

পাঁচরকম স্বাদের কথা হলো। এই পাঁচরকম স্বাদের কী কী খাবার খেয়েছ তা নীচে লেখো :

টক	মিষ্টি	ঝাল	নোনতা	তেতো

শাকপাতার খোঁজখবর

বৈশাখীর ঠাকুরদার মা বাগানে ঘুরে ঘুরে নানারকম শাক তোলেন। বেলে শাক, ব্রাহ্মী শাক, ঢেঁকি শাক, হিঞ্চে আরো কত কী! নিজেই কোটেন।

ঘরে হয়তো লাউ শাক কিংবা পুঁই শাক রান্না করা আছে। তবু কিছু ব্রাহ্মী শাক ধুয়ে, কুটে বৈশাখীর ঠাকুমাকে বললেন— বউমা, রান্না করে বুড়িকে দিও।

বৈশাখীকে উনি বুড়ি বলে ডাকেন। বৈশাখী ওঁকে বলে বড়োঠাকুমা।

বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিজ্জ খাদ্যের নাম

খেতে বসে বৈশাখী বলল— বড়োঠাকুমা, এটা কী শাক ?

বড়োঠাকুমা বললেন— এটার নাম ব্রাহ্মী শাক। খাও, উপকার পাবে।

বৈশাখী বলল --- আচ্ছা, কোনটা শাক আর কোনটা ঘাস কী করে চেনো ?

বড়োঠাকুমা বললেন— চোখ মেলে দেখলেই বোঝা যায়। আমার সঙ্গে এক মাস বাগানে ঘুরলেই কোনটা শাক আর কোনটা ঘাস তা বুঝবে।

বৈশাখী ভাবল, কোনটা খাবার জিনিস আর কোনটা তা নয় – সেটা কী করে বোঝা যায় ? স্কুলে গিয়ে দিদির কাছে জানতে চাইল সে কথা।

দিদিমণি বললেন— যা খেয়ে হজম করা যায় তা খাবার জিনিস, খাদ্য। ঘাস খেলে মানুষের হজম হবে না। তাই ঘাস মানুষের খাদ্য নয়।

মঙ্গলা বলল — দিদি, গোরুরা ঘাস হজম করতে পারে। তাই ঘাস গোরুদের খাদ্য ?

— ঠিক। কিছু জিনিস আছে যার এক অংশ মানুষের খাদ্য। অন্য অংশ মানুষের খাদ্য নয়, কিন্তু চেনা জীবজন্তুদের খাদ্য।

বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিজ্জ খাদ্যের নাম

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

কিছু জিনিসের এক অংশ মানুষের খাদ্য, অন্য অংশ চেনা জীবজন্তুর খাদ্য। নীচে সেগুলো লেখো :

মানুষের খাদ্য অংশ	মানুষের খাদ্য নয় কিন্তু চেনা অন্য জীবজন্তুর খাদ্য অংশ
১. আম ও লিচুর শাঁস,	আম, লিচু ও কাঁঠালের রস। কাঁঠালের কোয়া, বীজ। খোসা (গোরু, ছাগলের খাদ্য)
২.	মাছের নাড়িভুঁড়ি, কাঁটা (কুকুর, বিড়াল, কাকের খাদ্য)

খাদ্যের ভালোমন্দ

বাড়ি ফিরে সুহাস ভাবল, খাদ্য খেলেও তো অনেক সময় হজম হয় না। পেট খারাপ হয়। বমি হয়।

পরদিন স্কুলে এসে বলল সেকথা।

দিদিমণি বললেন— দুটো কারণে এমন হতে পারে। বেশি খেলে আর খারাপ হয়ে যাওয়া খাবার খেলে।

টিকলু বলল— খাবার খারাপ হয়ে যায় কী করে?

— ভ্যাপসা গরমে পচে যেতে পারে। বাসি হয়ে ভিতরে ভিতরে খারাপ হয়ে যেতে পারে। আবার ছাতা পড়েও নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

তুতাই বলল— বেশি ঝাল দেওয়া খাবারও হতে পারে?

সানিয়া মজা করে বলল— ওঃ! তোর ঝাল সহ্য হয় না বুঝি?

এসব শুনে দিদি একটু হাসলেন। বৈশাখী বলল— দিদি,

বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিজ্জ খাদ্যের নাম

বাসি, পচা সব যদি খারাপ খাদ্য হয় তাহলে ঘাসকে কী বলব? অখাদ্য?

— ঠিক। ঘাস মানুষের কাছে অখাদ্য।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

মানুষের খাদ্য আর অখাদ্যের তালিকা আছে। ওই তালিকায় আরও খাদ্য ও অখাদ্যের নাম লেখো:

খাদ্য	অখাদ্য
ভাত, রুটি, ...	খড়, ...
সরষে, ...	সরষের খোসা,........................
ফুলকপি, পালং শাক, ...	....
ওল, কচু, ...	....
আখ, তাল, ...	....
আম, কমলালেবু, ...	....

অনেকরকম শাকসবজি

গাছের পাতা, ডাঁটা, ফুল, কুঁড়ি, ফল, বীজ সবই আমরা খাই। ধানের বীজটার খোসা তুললেই চাল হয়। তা সিদ্ধ করলেই ভাত। গমেরও বীজ গুঁড়ো করে হয় আটা। জল দিয়ে মেখে আর বেলে, সেঁকে নিলেই রুটি।

কিন্তু ফুলকপিটা কী? ফুল, নাকি কুঁড়ি? সমীর বলল— কুঁড়ি। ফুটে গেলে ভালো সিদ্ধ হয় না।

রেবা বলল--- তাহলে পেঁয়াজকলিটা ফুলের বোঁটা নয়, কুঁড়ির বোঁটা।

বাড়িতে পেঁয়াজ দেখে সম্পৎ ভাবল, পেঁয়াজটা কী?

রিম্পা ভাবল, শিমের সবটাই খাদ্য। কিন্তু কড়াইশুঁটির শুধু বীজটা খাই। খোসা ফেলে দিই। গোরু খায়।

উচ্ছের বীজ রিনার খুব অপছন্দ। বীজ ফেলে খায়। তবে পটলের বীজ কচি থাকলে খেয়ে নেয়। রিনা ভাবতে লাগল, উচ্ছে, পটল এসবের বীজ কি খাদ্য? না অখাদ্য?

পরদিন দিদিমণিকে সবাই এসব ভাবনার কথা বলল।

শুনে দিদি বললেন— পেঁয়াজ হলো গাছের কাণ্ড! ধান, গম, ডাল এইসবের বীজটাই খাদ্য। শিম, কড়াইশুঁটিরও তাই।

সম্পৎ বলল— শিম, বরবটি, বিন কচি থাকলে? তখন তো সবটাই খাওয়া যায়।

— ঠিক বলেছ। তবে উচ্ছে, পটল, লাউ এসবের বীজ একটু পুষ্ট হয়ে গেলে আর ভালো খাদ্য থাকে না। হজম হয় না। খুব কচি বীজ অবশ্য খাওয়া যায়।

আয়েষা বলল— দিদি, সজনে ডাঁটা কিন্তু ডাঁটা নয়, সজনের ফল। ভিতরে বীজ থাকে। খুব পেকে গেলে অখাদ্য!

— ঠিক বলেছ। শাক গাছ বড়ো হলে তার ডাঁটা খাই আমরা। নটে ডাঁটা, পুঁই ডাঁটা। ওগুলো ওইসব শাকগাছের কাণ্ড।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

কোন গাছের কোন অংশ আমাদের খাদ্য ? সেগুলো নীচে লেখো :

পাতা	ডাঁটা/কাণ্ড	বোঁটা	কুঁড়ি	ফুল	ফল	বীজ
		পান				
		পেঁয়াজকলি				

শাকপাতা তরকারি
খাওয়া খুব দরকারি

তুতাইরা কাঁচা শশা, টম্যাটো, পেঁয়াজ, গাজরের স্যালাড খায়। তুতাই একদিন বাড়ির পাশের সবজি বাগানে ঘুরছে। ঢ্যাঁড়শ, ঝিঙে, কাঁকুড় হয়েছে।

হঠাৎ ও ভাবল, ঢ্যাঁড়শ কি কাঁচা খাওয়া যাবে? দেখি না খেয়ে! ঝাল তো আর নয়! একটা ঢ্যাঁড়শ তুলে খেয়ে দেখল। খেতে মন্দ নয়। তবে একটু ভয় হলো। হজম

হবে তো? কাঁচা ঢ্যাঁড়শ কি খাদ্য? স্কুলে গিয়ে টিপাইকে সব বলল। টিপাই হেসে বলল--- আমি কত খেয়েছি! কচি ঝিঙে, কাঁকুড় খেয়ে দেখিস। সব হজম হয়ে যাবে।

দিদিমণি এলে তুতাই জানতে চাইল— শশার মতো কী কী জিনিস কাঁচা খাওয়া যায়, দিদি?

দিদিমণি বললেন— কচি থাকলে

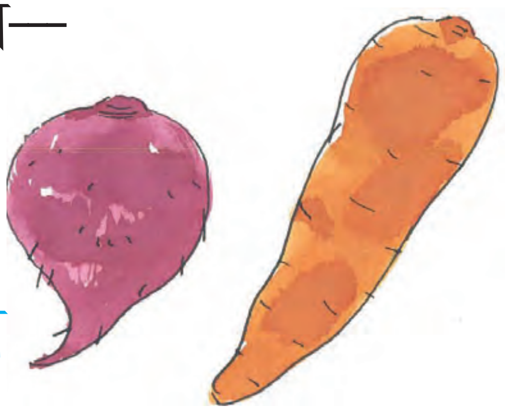

অনেক রকমের আনাজ কাঁচা খাওয়া যায়। একসময় তো মানুষ রাঁধতে শেখেনি। সবই কাঁচা খেত। তোমরাও খেতে পারো। তবে কোনো আনাজ কাঁচা খেলে ভালো করে ধুয়ে নিও।

ফতেমা বলল— দিদি, সবজি আর আনাজ একই কথা?

— কেউ বলেন সবজি। কেউ বলেন আনাজ। রান্নার পরে বলে তরকারি। আবার কাঁচা আনাজকেও অনেকে তরকারি বলেন। কিছু কিছু আনাজের নানা নামও আছে। যেমন হোপা আর চিচিঙ্গা, একই আনাজ।

তুতাই বলল— ঢ্যাড়শ আর ভেন্ডি, একই আনাজ।

মঙ্গলা বলল— দিদি, আলু কি আনাজ?

— হ্যাঁ। রাঙা আলু, মেটে আলু সবই। এককথায় মাটির নীচের সবরকম আলুই আনাজ।

সাগিনা বলল— দিদি, ওল, কচুও কি আনাজ?

— হ্যাঁ। তবে ওল, কচু যেন কাঁচা খেতে যেও না।

জন বলল— দিদি, কী শাক খেলে কী উপকার?

বৈশাখী চট করে বলল— আমি জানি। ব্রাহ্মী শাক খেলে উপকার হয়। আমার বড়োঠাকুমা বলেছে।

— অনেকে তাই বলেন। তবে ভাজলে খেতেও ভালো লাগে।

কালু বলল— আর নিমপাতার কী উপকার?

দিদি হেসে বললেন— নিমপাতা খোস-পাঁচড়া হতে দেয় না।

রমজান বলল— আর আনাজ? কোন আনাজের কী উপকার?

— কাঁচকলা রক্তাল্পতায় উপকারী। পেঁপে হজম করায় সাহায্য করে। বিট-গাজরের মতো রঙিন সবজি অনেক গুরুতর রোগ প্রতিরোধ করে।

দিলীপ বলল— দিদি, মোচা খেলে কী উপকার হয়?

— তুমি মোচা ভালোবাসো? মোচাও রক্তাল্পতার সমস্যা কমায়। শোনো, অনেক রকম শাক। অনেক রকম আনাজ। এসব থেকে অনেক ওষুধও তৈরি হয়। সব কি আর আমি জানি? এসব নিয়ে সবাই বাড়ির বড়োদের সঙ্গে আলোচনা করবে। তারপর স্কুলে এসে নিজেদের মধ্যেও কথা বলবে।

রীতা বলল--- আমাদের পাড়ার নরেনদাদু তো কবিরাজ। সবাইকে শাক-সবজি খেতে বলেন। ওঁকে জিজ্ঞেস করব?

— তাহলে আরো ভালো হয়। অন্য চেনা ডাক্তারদের সঙ্গেও কথা বলতে পারো।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

নানারকম শাক, পাতা, আনাজের নাম ও সেগুলো খেলে কী উপকার হয় তা নীচে লেখো :

শাক-পাতা আনাজের নাম	খাওয়ায় কী উপকার

ফল খাওয়ার সুফল

জল আর ফল। শরীরের দুটোই চাই। হজমে সাহায্য করে জল। তাছাড়া খাদ্যের সঙ্গে আমরা কিছুটা অখাদ্য খেয়ে ফেলি। সেই অখাদ্য শরীর থেকে বের করতেও সাহায্য করে জল। তাই দিনে অন্তত দুই-তিন লিটার জল খেতে হবে।

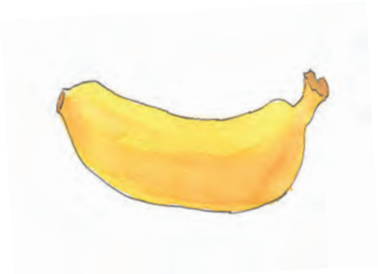

নানারকম ফল শরীরের দরকার। ফলের শাঁসে আর রসে অনেক কিছু থাকে। সেগুলো শরীরের জন্য খুব দরকারি। সেই দরকারি জিনিসগুলো অন্য কোনো খাবার থেকে পাওয়া যায় না।

এটুকু শুনেই ইমরান বলল—

দিদি, অসুখ হলে মা ফল খেতে দেন।

দিদিমণি বললেন— বেশিরভাগ ফল সহজে হজম হয়। অসুখ-বিসুখ হলে শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো খুব নিস্তেজ হয়ে পড়ে। তখন শরীর সব খাদ্য হজম করতে পারে না। তাই ফল খেলে ভালো হয়। আবার রোগ আটকাতেও ফল দরকার। অন্য খাবার কম খেয়ে ফল বেশি খেলে মোটা হওয়ার সম্ভাবনা কমে।

মীনা বলল— ফল খেতেও খুব ভালো। আবার ফলে জল থাকে প্রচুর।

— অনেকে জল খেতে চায় না। ফল খেলে তাদের শরীর জলও পেয়ে যায়।

রেহানা বলল— একটা ফল খেলে আর জল খাওয়াই লাগে না।

রাসু বলল— ডাবের কথা বলছিস তো? কিন্তু ডাব কি ফল? ডাবে তো শুধুই জল থাকে!

— অনেকে তাই বলেন। কিন্তু আমার মনে হয় আরো কিছু থাকে। নইলে খেতে অন্যরকম হয় কী করে? পেটের

অসুখ হলে ডাবের জলে তো খুব উপকার হয়! তারপর একটু থেমে বললেন— ডাব গাছে হয়। ফল তো বটেই। পাকলে নারকেল বলে। বীজের মধ্যে শাঁস থাকে। সেটাই আমরা খাই। কোনো ফলে জলের ভাগ বেশি থাকে। ডাবে খুব বেশি।

রাসু বলল— কিন্তু খেজুর রস কি ফল থেকে পাই? ওটা তো গাছের রস!

দিদি বললেন — ঠিক বলেছ। তারপর একটু ভেবে বললেন— গাছের ফুল থেকে ফল হয়। ফলের একটা আবরণ থাকে। মানে, খোসা থাকে। কিছু গাছের রসও আমাদের খাদ্য।

পরাগ বলল— দিদি, ডাব সারা বছর পাওয়া যায়। খেজুর রস শুধু শীতকালে।

— হ্যাঁ। কিছু ফল সারা বছরের, কিছু গরমের, কিছু শীতের। কিছু আছে কাঁচায় আনাজ। পাকলে ফল।

কর্মা বলল— জানি দিদি। পেঁপে, কাঁকুড়। শশাটা আবার

উলটো। কচি থাকলে ফল। পেকে গেলে মা রান্না করে। শ্রাবণী বলল--- আমের কথা বললি না? কাঁচা আমের ঝোল খাস না বুঝি? রাসু বলল--- আমরা লিখব? কোনটা কোন সময়ের? কোনটা কাঁচায় সবজি, পাকলে ফল?

--- লিখবে তো বটেই। কোনটার কেমন স্বাদ তাও লেখো। কোনটার কী উপকার তাও লেখো।

হৈমন্তী বলল— আগে বাড়ির বড়োদের সঙ্গে, তারপর বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলে নেব তো?

— হ্যাঁ! কবিরাজদাদুর কথাও ভুলবে না। তাঁর সঙ্গেও কথা বলবে।

বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিজ্জ খাদ্যের নাম

কৃষিকাজ

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

কোন ফল কোন ঋতুতে হয় ? কাঁচা খায় না পাকা খায় ? খাওয়ায় কী উপকার ? নীচে লেখো:

নাম	কোন ঋতুতে হয়	কী অবস্থায় আনাজ	কী অবস্থায় ফল	খাওয়ায় কী উপকার
আম	বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা	কাঁচা	কাঁচা, পাকা—দুটোই	

যে সব ফল খাবার নয়

অনেক বছর আগের কথা। কেতকীর ঠাকুরদার মা তখন ছোটো। পাড়ার সিধু সোরেন জঙ্গলে গিয়েছিলেন মধু আনতে। মধুর সঙ্গে কয়েকটা অচেনা ফল নিয়ে ফিরেছিলেন। জামের মতো দেখতে। কেউ আগে দেখেনি। সিধু নিজে খায়নি। কিন্তু রান্না ভাতটুকু ছেলেকে দিয়ে সিধুর মা ওই জাম খেয়েছিলেন। তারপর কী পেটব্যথা! শহরের হাসপাতালে ভরতি করতে হয়েছিল।

সবাই জানে সেকথা। বড়োঠাকুমার কাছে কেতকীও শুনেছে অনেকবার। তাই সে বলল— দিদি, বিষফলও

বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিজ্জ খাদ্যের নাম

তো আছে?

নরেন বলল— বিষ কী?

— যা একটু খেলেই শরীর খারাপ হয়। হাত-পা অবশ হয়ে যায়। বেশি খেলে মানুষ মরেও যেতে পারে।

হাসান বলল— আম যে বিষ নয় তা কী করে জানা গেল?

— মানুষ খেয়ে দেখেছে। যেটা বিষফল সেটা খেয়ে অসুখ হয়েছে। কেউ মারা গেছে। আবার কখনও দেখেছে সেসব ফল খেয়ে পশু-পাখিরা মারা গেছে। তাই দেখে মানুষ শিখেছে। পরে অন্যরা আর তা খায়নি।

দয়াল বলল— এভাবে তো অনেকে মারা গেছে!

কেতকী বলল--- অনেকদিন আগে তাই না? বড়োঠাকুমারা যখন ছোটো সেই সময়।

— তারও অনেক আগে। তোমার বড়োঠাকুমা ছোটো ছিলেন সত্তর-আশি বছর আগে। কোনগুলো বিষফল তা তখন জানা। মানুষ ফল চিনতে শিখেছে অনেক আগে। তখন কেউ চাষ করতে জানত না। রান্না করতে জানত না।

একথা শুনে কেতকী সিধুর মায়ের গল্পটা বলল।

শুনে দিদি বললেন— দু-একটা বিষফলের কথা এখনও অজানা থাকতে পারে। তাই অচেনা ফল খেয়ো না।

আমিনা জানতে চাইল—
কোন কোন ফল বিষ?

--- কিছু কিছু বিষফলের গায়ে কাঁটা আছে। তবে কাঁটা নেই এমন বিষফলও হয়। এসব নিয়ে বাড়ির বড়োদের জিজ্ঞেস করো। আর কী কী বিষফল আছে তাও জেনো।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

কী কী বিষফলের নাম জানা গেল? নীচে লেখো, ছবি আঁকো। কোনগুলোর গায়ে কাঁটা আছে তাও লেখো:

বিষ ফলের নাম ও ছবি	কাঁটা আছে কি	বিষফলের নাম ও ছবি	কাঁটা আছে কি

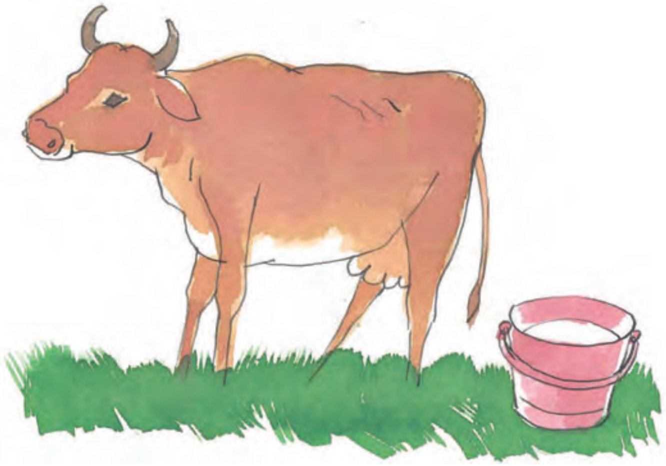

প্রাণীজ খাবার

রমেশ ডিম খেতে খুব ভালোবাসে। ডিম সিদ্ধ। ডিম ভাজা। সবই রমেশের খুব পছন্দ। মাছের মতো কাঁটা বাছতে হয় না। মাংসের মতো দাঁতে আটকায় না। এজন্য

অনেকেরই ডিম পছন্দ। যেদিন দুপুরের খাওয়ায় ডিম থাকে সেদিন খুব মজা।

তবে লুৎফার আবার মাছ পছন্দ। রুই, মৃগেল, ট্যাংরা, বেলে, ইলিশ সব মাছ ভালোবাসে। লুৎফার চাচারা পুকুরে মাছচাষ করেন। বর্ষার শুরুতে ছোটো ছোটো পোনা ফেলেন পুকুরে। খাবার দেন নিয়মিত। তিন মাস পর থেকেই জাল দিয়ে পুকুর থেকে মাছ ধরা শুরু করেন।

এদিকে ডমরু মাংস পেলে আর কিছু চায় না। তাপসের ছোটোবেলার অভ্যেস শেষপাতে একটু দুধ-ভাত খাওয়া।

আকবরের সর্দি-কাশির ধাত। তাই ওর মা ওকে রোজ সকালে মধু খেতে দেন।

এসব শুনে দিদিমণি বললেন—

নানা প্রাণী থেকে আমরা এসব খাবার পাই। তাই এগুলোকে বলে প্রাণীজ খাদ্য।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

কোন প্রাণীদের থেকে নানারকম প্রাণীজ খাবার পাওয়া যায়? ওই প্রাণীদের কীভাবে পালন করা হয়? নীচে লেখো:

খাদ্যের নাম	ডিম	মাছ			
কোন প্রাণীদের থেকে পাই	মুরগি, হাঁস				
ওই প্রাণীদের কোথায় পালন করা হয়					
ওই প্রাণীরা কী কী খায়					

দুধ, দই, ছানা

চিনু ছোটোবেলায় খুব রোগা ছিল। তখন থেকে ওর মা রোজ ওকে ছানা খাওয়ান। রিঙ্কু দই ভালোবাসে। নেমন্তন্ন বাড়ির মজাই হল চিনি দিয়ে পাতা দই, রসগোল্লা আর সন্দেশ। রিঙ্কুর মা দুধে কফি মিশিয়ে খান। ওর ভাই পম ক্রিম বিস্কুট, কেক আর চকোলেট খেতে চায়। আইসক্রিম বা মালাই বরফ পেলেও খুব খুশি।

ওদের কথা শুনে দিদিমণি বললেন— যা যা বলেছ তার সবই দুধ থেকে তৈরি। তবে দুধের সঙ্গে কিছু কিছু জিনিস মেশাতে হয়। কম-বেশি গরম বা ঠান্ডা করতে হয়।

রেহানা বলল— ছানা করতে গেলে দুধ গরম করতে হয়। আইসক্রিম করতে গেলে ঠান্ডা করতে হয়।

ভাজা খাবার

কেক-চকোলেটের মতো আরো কত কিছু দোকানে পাওয়া যায়। চানাচুর, নানারকম চিপস, নিমকি, আরও কত কি! কিনেই খাওয়া যায়। খুব মুখরোচক।

কিন্তু, তামিমের মনে একটুও সুখ নেই। যেই একটু চানাচুর খেতে যাবে অমনি ওর নানা ডাকবেন। বলবেন— ওগুলো অনেকদিন আগে ভাজা। পুরোনো তেলের গন্ধ। ওগুলো বিষের মতো। তার চেয়ে বরং বাড়িতে চপ-বেগুনি ভাজা হোক। মুড়ি দিয়ে খাও।

এসব শুনে ক্লাসের সবার হলো মুশকিল। পিন্টু দিদিমণির কাছে জানতে চাইল--- চানাচুর অনেকদিন আগে তেলে ভাজা?

— হ্যাঁ। তেলেই ভাজা। তবে কিছুদিন আগে ভাজা তো বটেই।

আয়েষা বলল—এক প্যাকেট চানাচুর বেশ কিছুদিন চলে।

— ওরা এমন কিছু মেশায় যাতে কিছু বেশিদিন ভালো থাকে।

কেতকী বলল— বাড়িতে গরম তেলে ছেঁকে ভাজাপিঠে হয়। তাও বেশ কয়েকদিন ভালো থাকে।

দিদি বললেন— ঠিক বলেছ। দোকানে নিমকি, চানাচুর, আলুভাজার প্যাকেট পাওয়া যায়। ময়দা, বেসন, ডাল থেকে এসব তৈরি করে প্যাকেট করা হয়। তারপর বিক্রি হয়। দু-তিন মাস ভালো থাকে। কখনও আবার প্যাকেটে তারিখ লেখা থাকে। কত দিনের মধ্যে খেতে হবে। এসব জিনিস কেনার সময়ে ওই তারিখটা অবশ্যই দেখে নিও।

লক্ষ্মীমণি বলল— পাঁউরুটিও কি ভাজা খাবার?

— না, তেলে ভাজা নয়। পাঁউরুটি অন্যভাবে তৈরি করা। আগুনে সেঁকা। দু-তিন দিন ভালো থাকে। তারপর একটু

থেমে বললেন--- আগে থেকে খাওয়ার যোগ্য করে আরো অনেক কিছু প্যাকেট করে বিক্রি করা হয়। সেগুলোকে তৈরি খাবার বলে।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

নানাধরনের প্যাকেট করা তৈরি খাবারের নাম লেখো। কী দিয়ে কোনটা তৈরি হয় তাও লেখো:

খাদ্যের স্বাদ	খাদ্যের নাম	কী কী দিয়ে তৈরি হয়
মিষ্টি		
নোনতা		
টক		
টক-ঝাল-মিষ্টি		

উনুন আর আগুন

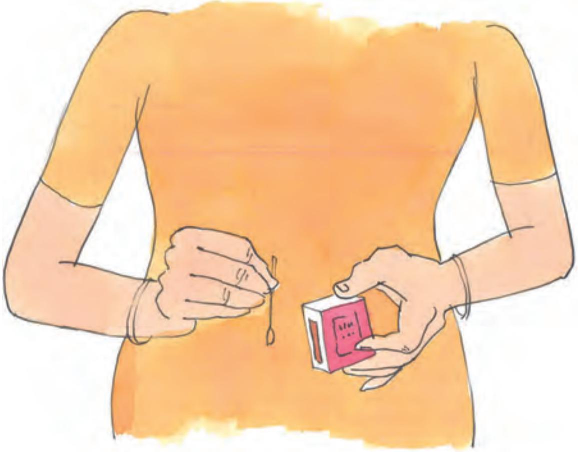

বাড়িতে রোজ রান্না হয়। কিন্তু দিদিমণি বলছিলেন অনেকদিন আগে নাকি লোকে রাঁধতে পারত না! তেল-মশলার ব্যবহার জানত না। কমল বলল— মানুষ তখন কী করে খেত?

দীপু বলল--- বেগুন পোড়া খাসনি? ওইরকম পুড়িয়ে খেত!

আয়ুব বলল— যা পুড়িয়ে খাওয়া যায় না, তা খেত না?

কেতকী বলল— খাবে না কেন? কাঁচা খেত।

হীরা বলল— কিন্তু রাঁধতে শেখেনি কেন? কড়া ছিল না?

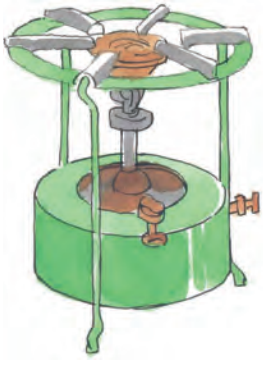

কেতকী বলল— নাকি উনুন ছিল না? আমি জানি, বড়োঠাকুমাদের ছোটোবেলায় গ্যাসের উনুন ছিল না।

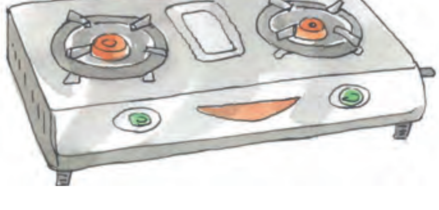

ফতেমা বলল— গ্যাসের উনুন না থাকলে রান্না হবে না? আমাদের বাড়িতে এখনও গ্যাসের উনুন নেই। কাঠের উনুন, কয়লার আঁচ অথবা কেরোসিনের স্টোভে রান্না হয়।

এসব শুনে দিদিমণি একটু হাসলেন। বললেন— আগুন জ্বালাতে পারত কিনা সেটা ভেবেছ? তোমাদের বাড়িতে কীভাবে আগুন জ্বালানো হয়?

ডমরু বলল— দেশলাই কাঠি দিয়ে। দেশলাই বাক্সের গায়ে কাঠির বারুদ ঘষলেই আগুন জ্বলে ওঠে।

— বাক্সের গায়ে কী থাকে দেখেছ?

ডমরু বলল— দেখেছি। বাক্সের গায়েও বারুদ। যেদিকে বারুদ নেই সেদিকে ঘষলে জ্বলে না।

— বাঃ! তুমি তো খুব ভালোভাবে দেখেছ! আর কী করে আগুন জ্বালানো যায়?

টিপাই সাধারণ লাইটারের কথা বলল। ফতেমা গ্যাসের উনুন জ্বালানোর লাইটারের কথা বলল। সুজান আগুন থেকে আগুন জ্বালানোর কথা বলল।

ইসমাইল বলল— রান্না করতে পারা বড়ো সহজ নয়। আগুন, উনুন, বাসন, খাবার-দাবার সব দরকার।

দিদি হেসে বললেন— ঠিক তাই। ধরে নাও চাল, মাছ, আনাজ আছে। তবে কাঁচা। ভাত, মাছের ঝোল, তরকারি হবে। আর কী কী লাগবে? সেগুলো নিয়ে কী কী করবে?

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

কাঁচা খাদ্য রান্না করতে আর কী কী লাগে? আর কী কী করতে হয়? নীচে লেখো:

কাঁচা খাদ্যের নাম	এর থেকে কী তৈরি হয়	কীভাবে তৈরি হয় (ভাজা, সেঁকা নাকি অন্যভাবে)
চাল, আটা,		
ডাল		
আনাজ		
দুধ		
মাছ		
মাংস		
....		
....		

থালা-বাসন

বাড়ি ফেরার সময় কেতকী ভাবতে লাগল। রান্না করার জন্য মানুষ কত কী তৈরি করেছে। কত রকমের বাসন! অ্যালুমিনিয়াম, স্টিল আরো কত কী! বাড়ি পৌঁছে বড়োঠাকুমাকে সেকথা বলল।

বড়োঠাকুমা সব শুনে বললেন— আগে এসব ছিল না। মাটির বাসন ছিল। মাটির হাঁড়ি, কড়া। পিতলের খুন্তি। পিতল আর কাঁসার গ্লাস, বাটি।

কেতকী অবাক। ভাত রাঁধতে গেলে তো চালে জল দিতে হবে! জল দিলে মাটি গলে যাবে না?

বড়োঠাকুমা হেসে বললেন— হাঁড়ি তো মাটি পুড়িয়ে তৈরি। মাটি দিয়ে তৈরি ইট কী জল লাগলে গলে যায়? এবার কেতকী বুঝল, মাটি পুড়িয়ে মাটির হাঁড়ি তৈরি। তাই বলল— আচ্ছা, কাঁচা ইট তো একটা কাঠের ছাঁচে তৈরি করে। কাঁচা হাঁড়ি তৈরির ছাঁচটা কেমন?

এবার বড়োঠাকুমার হাসি আর থামে না। একটু পরে বললেন— চলো, পুব পাড়ায়। তোমার পালদাদুদের বাড়ি। সেখানে দেখবে।

পালদাদু চায়ের দোকানের জন্য মাটির ভাঁড় তৈরি করছিলেন। কেতকীকে ভাঁড় তৈরি করা দেখাল।

স্কুলে কেতকী মাটির ভাঁড় তৈরির কথা বলল। দিদিমণি বললেন— ওখানে যে চাকাটা দেখলে, ওটাকে বলে কুমোরের চাকা। যারা ওটা প্রথম বানিয়েছিল তারা তখনকার সবচেয়ে বুদ্ধিমান মানুষ।

আয়ুব বলল— আগুন জ্বালাতে শেখার পরে মানুষ এসব বানিয়েছে। তারপরে ভাত রান্না করা শিখেছে মানুষ?

— ঠিক বলেছ। পরে পিতল-কাঁসা, লোহার বাসনও তৈরি করেছে।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

তোমার বাড়িতে যা যা বাসনপত্র আছে তার নাম লেখো আর ছবি আঁকো:

লোহা ও স্টিলের বাসনপত্রের নাম ও ছবি	পিতল-কাঁসার বাসনপত্রের নামও ছবি	অন্য জিনিস দিয়ে তৈরি বাসনপত্রের নাম ও ছবি

চলল খাবার দেশে-বিদেশে

কেতকী ভাবল চালের কথা। চাল কি তখন ছিল? পরের দিন স্কুলে কেতকী চালের কথা বলল। দিদিমণি শুনে বললেন— ঠিকই বলেছ। তখন চাষ হতো না। বনের গাছে গাছে যা ফলে থাকত তা জোগাড় করতে হতো। তাই রোজ কেউ চাল পেত না।

উত্তম আলু খেতে খুব পছন্দ করে। তাই বলল— আর আলু?

— এদেশে আলু এসেছে মোটে চার-পাঁচশো বছর আগে। অনেক দূরের দেশ থেকে।

আসিফ বলল— কী করে এল?

— জাহাজে করে। সেই দেশ আর আমাদের দেশের মাঝে অথই জলের সমুদ্র। জাহাজে করে সেই সমুদ্র পেরিয়ে মাঝে মাঝে লোক আসত। তারাই আলু এনেছিল।

বৈশাখী আম ভালোবাসে। সে বলল— আর আম?

— আম এদেশেরই ফল। নানারকমের আম হয়।

বৈশাখী বলল— জানি দিদি। আমাদের বাগানেই পাঁচরকম আম হয়।

উত্তম জানতে চাইল— আর কী অন্য দেশ থেকে এসেছে?

দিদি বললেন— এমন অনেক কিছু আছে। এদেশে যা নেই লোকেরা জাহাজে করে তা আনত। সে দেশে যা নেই, তা নিয়ে যেত।

দিদি আরো অনেক কিছু বললেন। বোর্ডে ছয়রকম খাবারের কথা লিখে দিলেন। কোনটা অন্য দেশ থেকে এদেশে এসেছে। কোনটা এদেশ থেকে অন্য দেশে গেছে। সবাই পড়ল। দিদির কথা শুনল। তারপর বুঝল :

আলু: অন্য দেশ থেকে এদেশে এসেছে।

টম্যাটো: অন্য দেশ থেকে এদেশে এসেছে।

আম: এদেশ থেকে অন্য দেশে গেছে।

লঙ্কা: অন্য দেশ থেকে এদেশে এসেছে।

আনারস: অন্য দেশ থেকে এদেশে এসেছে।

গোলমরিচ: এদেশ থেকে অন্য দেশে গেছে।

আগে স্থলভাগে শুধু বন ছিল। বনের ফলমূলের কোনটা খাদ্য তা খেয়ে দেখে বুঝত লোকেরা। নানা জায়গার লোক নানারকম খাদ্য চিনেছিল। দূরের দুটো ডাঙার মধ্যে যোগাযোগ ছিল না। মাঝে ছিল সাগর। অথই জল। অনেক পরে বড়ো জাহাজ তৈরি করতে

শিখল মানুষ। তারপর এক দেশের লোক অন্য দেশে যেতে পারল। সঙ্গে নানারকম খাবারও ছড়িয়ে পড়ল দেশে-বিদেশে।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

আম নিয়ে যা জানো নীচে লেখো। দরকারে বড়োদের কাছে জানতে চাও :

নানারকম আমের নাম	সেই আম কোথায় পাওয়া যায়	কোন সময় পাকে	স্বাদ কেমন

পশুপালন আর আগুনের ইতিহাস

আগেকার দিনে লোকে ভাতের চাল সহজে পেত না। তবে নদী ছিল। নদীর কাছেই ঘরবাড়ি করত। নইলে খাবার জল কোথায় পাবে?

শিকার

কৃষিকাজ

অন্য জলা জায়গাও ছিল। মাছ পাওয়া যেত। বনের জীবজন্তু শিকার করে মাংস পাওয়া যেত। লাঠি, পাথর দিয়ে পশু শিকার করত। তির-ধনুক, বল্লম ছিল না।

এসব শুনে আয়েষা বলল--- আগেকার মানুষ গোরু-ছাগল, হাঁস-মুরগি পুষত না?

দিদিমণি বললেন— প্রথম দিকে পুষত না। কোন জন্তু পোষ মানবে তা তো বোঝেনি। সেটা বুঝতে পারার পর পশুপালন শুরু হয়।

রিম্পা বলল— আর ফলমূল?

— বনের ফলমূল কুড়িয়ে আনত। গাছ থেকে পেড়ে আনত। যখন যা পেত তাই খেত।

টিকাই বলল— সবই কাঁচা খেত?

— প্রথমে আগুনের ব্যবহার জানত না। তখন সবই কাঁচা খেত। পরে আগুনের ব্যবহার শিখল। তখন কিছু কিছু জিনিস আগুনে পুড়িয়ে খেত।

ইতু বলল---আগুন জ্বালাত কীভাবে? দেশলাই তো ছিল না!

— প্রথম দিকে আগুন জ্বালাতে পারত না। ঝড় হলে বনের গাছের শুকনো ডালে ডালে ঘষা লাগত। আগুন জ্বলে যেত। সেই কাঠ এনে রাখত। একটা কাঠ থেকে আর একটা কাঠ ধরিয়ে নিত।

রবীন বলল— নিভে গেলে আর জ্বালতে পারত না?

— ঠিক তাই! অপেক্ষা করত। কবে আবার জ্বলন্ত কাঠ পাবে।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

আগেকার মানুষের খাবার জোগাড় করা আর রান্না করা বিষয়ে তোমার নানারকম ভাবনা নীচে লেখো:

কীভাবে খাবার জোগাড় করত	কী কী খাদ্য পেত (ছবি দিয়েও দেখাতে পারো)	কীভাবে খেত		
		আগুন ব্যবহার করার আগে	আগুন ব্যবহার করার পর পরই	মাটির হাঁড়ি, কড়া তৈরি করার পরে
বনে জঙ্গলে শিকার	হরিণ, গাধা, গোরু, মহিষ			

রংবাহারি পোশাক

দুই স্কুলের মধ্যে ফুটবল খেলা হচ্ছে। জার্সি পরা খেলোয়াড়রা মাঠে। লাল-কালো আর নীল-হলুদ জার্সি। গোলকিপারের ফুলহাতা গেঞ্জি।

অনেকেই খেলা দেখতে এসেছে। টিঙ্কু একটা হলুদ গেঞ্জি পরে এসেছে। ওর দিদি মুন্নি। সবুজ সালোয়ার, কামিজ পরে এসেছে।

টিঙ্কু দেখতে লাগল অন্যেরা কে কী পরেছে। রঘুদা লুঙ্গি আর কমলা রঙের জামা পরে এসেছেন। সরোজদাদু ধুতি আর ছাই রঙের পাঞ্জাবি পরেছেন। হারানকাকু সবুজ রংয়ের জামা পরেছেন।

হঠাৎ সবাই চেঁচিয়ে উঠল—গো-ও-ও-ও-ল! থতমত খেয়ে টিঙ্কু দেখল পাশে দীপা। বলছে— দেখ দেখ আমাদের স্কুল গোল দিল!

টিঙ্কু বলল —ওহ! আমি হারানকাকুর সবুজ জামাটা দেখছিলাম।

পরদিন ক্লাসে দীপা ঘটনাটা বলল। খুব হাসাহাসি হলো। তপন বলল— খেলা দেখতে গিয়েছিলি, না লোকের পোশাক?

দিদিমণি বললেন — বেশ তো। দেখেছে তাতে দোষ কী ! খেলা দেখাও হলো, পোশাক দেখাও হলো।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

গরমের সময়ে লোকে কী কী পরে তা নীচে লেখো:

কাদের পোশাক	পোশাকের নাম	পোশাকের রং	কী দিয়ে তৈরি

পোশাকে যায় চেনা

স্কুল থেকে ফেরার সময় টিঙ্কু বলল--- বলত দেখি দু-দলের দু-রকম জার্সি কেন?

ডমরু বলল— না হলে তো নিজের দলের লোকের কাছ থেকেই বল কাড়বে!

আমিনা বলল— গোলকিপারের আলাদা জার্সি কেন বলত?

মজিদ বলল—হাত দিয়ে বল ধরতে পারে কে? শুধু গোলকিপার। তার পোশাক তো আলাদা হবেই।

রিঙ্কু বলল— হাসপাতালেও ওইরকম। নার্সদের আলাদা করে চেনা যাবেই। ধবধবে সাদা শাড়ি। না হলে সাদা স্কার্ট। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদেরও ইউনিফর্ম থাকে।

তপন বলল— ডাক্তারবাবুরা একটা ঢোলা জিনিস পরেন। গলা থেকে পা পর্যন্ত। বর্ষাকালে আমরা যেমন রেনকোট পরি অনেকটা সেইরকম।

রিঙ্কু বলল— ওটাকে অ্যাপ্রন বলে।

টিকাই বলল— হোটেলে যাঁরা খাবার পরিবেশন করেন তাঁদেরও আলাদা পোশাক থাকে।

টিঙ্কু বলল— আর পুলিশ? পুরোটাই খাঁকি রঙের পোশাক।

দীপা বলল— না। কলকাতার রাস্তায় অনেক পুলিশের সাদা পোশাক আছে। আমি দেখেছি।

ডমরু বলল— মেলায় বা হাটে গেলেও নানারকম লোকের নানারকম পোশাক দেখা যায়।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

নানা কাজের নানা পোশাক। কী কাজে থাকলে লোকে কী ধরনের পোশাক পরে? নীচে লেখো:

কারা পরে	কী কী পরে	কেন ওইরকম পোশাক	পোশাকের রং

ঋতু-বদল পোশাক-বদল

কাজের সময় মানুষ যে পোশাক পরে, অন্যসময় তা পরে না। বাড়িতে কেউ স্কুলের ইউনিফর্ম পরে থাকে না। বাইরে গেলেই অন্য পোশাক।

শীতের সময় অবশ্য স্কুলেও নানা রঙের সোয়েটার পরা যায়। যার যা আছে। মুন্নি ফুল-আঁকা একটা সোয়েটার পরে। বাবাইদা একটা বুক খোলা মোটা সোয়েটার পরে আসে।

শীতের সময় অনেকে নানারকম চাদরও গায়ে দেন। কোনোটা মোটা উলের। কোনোটা খুব সরু উলের। দেখে বোঝা যায় না যে উল দিয়ে বোনা।

বড়োঠাকুমা বলেছিলেন, ওঁদের ছোটোবেলায় দু-একজনের সোয়েটার ছিল। এক ডাক্তারবাবু ছিলেন। কোট আর প্যান্ট পরতেন। সাহেবদের মতো। পাড়ার অন্য লোকেরা শীতে চাদর গায়ে দিত। কেউ কেউ দু-তিনটে জামা পরত।

বৈশাখী, দিদিমণিকে বলল— দিদি, এখন কি আগের চেয়ে বেশি সোয়েটার পাওয়া যায়?

দিদিমণি বললেন— এখন তো সব সিন্থেটিক উল। যত লোকে কিনবে, কারখানায় তত বেশি তৈরি করবে।

সাইনা বলল— কী থেকে তৈরি করে?

দিদি বললেন— খনিজ তেল থেকে। তারপর আবার বললেন— বর্ষাকালে যে বর্ষাতি পরো সেটা সিন্থেটিক। বর্ষাকালে অনেকেই সিন্থেটিক শাড়ি পরেন। তাড়াতাড়ি শুকোয়। কাচলে কোঁচকায় না। সেগুলোও ওই ধরনের তেল থেকে তৈরি হয়।

ওয়াসিম বলল--- গরমের সময় পরার জন্য সুতির কাপড় ভালো, তাই না?

--- ঠিক বলেছ। তাহলে পোশাক তৈরির নানারকম উপাদান বিষয়ে জানা গেল। কোনটা কোন ঋতুতে পরার জন্য, তাও বুঝেছ।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

কোন পোশাক কোন ঋতুতে পরা হয় তা নীচে লেখো। পোশাকের ছবি আঁকো:

পোশাকের নাম	কোন ঋতুতে পরা হয়	কেন ওই ঋতুতে পরা হয়	পোশাকের ছবি

উল, তুলোর হরেকরকম

কেতকী বলল— দিদি খনিজ তেল থেকে কী করে সুতো হয়?

দিদিমণি বললেন— খনিজ তেলে অনেক কিছু মিশে থাকে। তাই খনিজ তেল শোধন করে নেওয়া হয়। তারপর ওই তেল থেকে সুতো তৈরির উপাদান তৈরি করা হয়। তারপর ওই তৈরি করা সুতো দিয়ে কাপড় হয়। বড়ো বড়ো কারখানায় এসব হয়।

আয়েষা বলল— দিদি, কাপাস তুলোর সুতোকেই তো সুতি বলে?

— হ্যাঁ। কার্পাস তুলো।

কেতকী বলল— আমাদের জমিতে তুলোর চাষ হয়। আসিফের খালু গামছা বোনেন। আসিফ দেখেছে। লাল, সাদা, হলুদ সুতো কিনে আনেন খালু। বোনার পর চেক চেক দেখায়। সে বলল— সুতি দিয়ে গামছাও হয়।

বৈশাখী এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল। এবার বলল— দিদি, আগে কীসের উল ছিল?

— আগে ভেড়ার লোম থেকে তৈরি উল ছিল। কোনো কোনো ছাগলের লোম থেকেও উল হতো। খুব বেশি পাওয়া যেত না। সেই উল অবশ্য এখনও পাওয়া যায়। তাকে বলে পশম। উল কথাটা আসলে ইংরাজি।

রেহানা বলল— আর সিন্থেটিক উল?

— আসলে ওটাকে বলে ক্যাশমিলন।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

কোন পোশাক কীভাবে তৈরি হয় তা নীচে লেখো:

পোশাকের নাম	কী দিয়ে তৈরি	তৈরি করার জিনিসটা কী কী ভাবে পাওয়া যায়

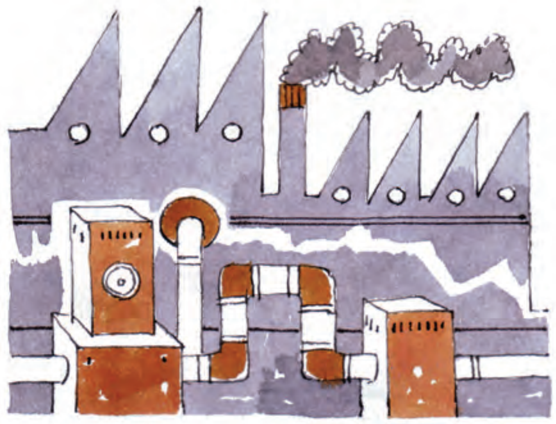

পোশাক তৈরি

ইমরানদের দর্জির দোকান। লোকেরা থান কাপড় আর গায়ের মাপ দিয়ে যায়। দোকানে ওই কাপড় মাপমতন কেটে ওর আব্বা সেলাই করেন। আব্বার কাছে জানতে চেয়েছিল ইমরান--- দোকানটা কবে তৈরি? আব্বা বলেছিলেন— আশি-নব্বই বছর আগে। তখন খদ্দরের জামা হতো খুব। খদ্দরের পাঞ্জাবিও তৈরি হতো। এখন বেশির ভাগটাই টেরিকটের প্যান্ট-জামা হয়।

আব্বার কাছে, দাদার কাছে, মায়ের কাছে জিজ্ঞেস করে ইমরান অনেক জেনেছে। খদ্দর আসলে সুতি। তুলোর মোটা সুতো। বাড়িতেই খদ্দরের থান কাপড়, ধুতি, শাড়ি তৈরি করত অনেকে।

স্কুলে সবাই মিলে কথা হচ্ছিল। বড়ো বড়ো কারখানায় খনিজ তেল থেকে সিন্থেটিক সুতো তৈরি হয়। সেই সুতো থেকে আবার থান কাপড় তৈরি হয়। খনিজ তেল আবার মাটির নীচে থাকে।

সুতির কাপড় তৈরি করাতেও অনেকের কাজ আছে। কার্পাস চাষ, তুলো তোলা। তুলো খুব উড়ে যায়। নাকে ঢুকে গিয়ে শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। সেই তুলো থেকে সুতো করা। তারপর সুতো বুনে কাপড় তৈরি!

ওদের কাছে এসব কথা শুনে দিদি অবাক। বললেন — তোমরা এতরকম পোশাক তৈরির কথা ভেবেছ? তাহলে বলো, কোন কোন পোশাক তোমরা ব্যবহার করো?

রবিলাল বলল— গরমের সময় সুতির কাপড় পরি।

বৈশাখী বলল— শীতকালে পরি পশমের কাপড়!

--- ঠিক বলেছ। আর কিছু ব্যবহার করো কী না ভাবো। কীভাবে পোশাক তৈরি হয় তা নিয়ে আরও আলোচনা করো।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

তোমার ব্যবহার করা পোশাক কীভাবে তৈরি হয় তা নিয়ে আলোচনা করে লেখো:

পোশাকের নাম	কে কে তৈরি করেন	কীভাবে তৈরি করেন

পোশাকের অতীতকথা

বড়োঠাকুমা একদিন বলেছিলেন, আগে এত সোয়েটার ছিল না। দিদিমণি বলেছিলেন, বড়ো বড়ো কারখানায় সিন্থেটিক কাপড় তৈরি হয়। আগে তো সেগুলোও ছিল না। তখন তাহলে লোকে পরত কী?

এই সব ভেবে বৈশাখী বড়োঠাকুমাকে বলল— তোমরা ছোটোবেলায় কী পরতে?

— তোমার বয়সে আমি শাড়ি পরতাম। ছোটো ছোটো শাড়ি ছিল। তার আগে ইজের ছিল।

— আর ছেলেরা কী পরত?

— তারা ধুতি অথবা লুঙ্গি পরত। আরো ছোটোরা ইজের পরত। মেয়েদের মতোই।

— তোমার ঠাকুরদা-ঠাকুমারা ছোটোবেলায় কী পরত?

— তাঁরা ছোটো থেকেই ধুতি আর শাড়ি পরতেন।

বৈশাখী খানিকক্ষণ ভাবল। তারপর বলল— আচ্ছা, মানুষ

পরিবারের বয়স্কদের ছোটোবেলার পোশাক ও বর্তমান শিশুদের পোশাক

প্রাচীন মানুষের পোশাক

যখন আগুন জ্বালতে শেখেনি, তখন কী পরত?

বড়োঠাকুমা বললেন--- ওসব তোমার দিদিমণিকে জিজ্ঞেস করবে।

পরদিন বৈশাখীর প্রশ্ন শুনে দিদিমণি বললেন— তখন জামাকাপড় তৈরি করবে কীভাবে?

টিপাই বলল— তাহলে কী পরত?

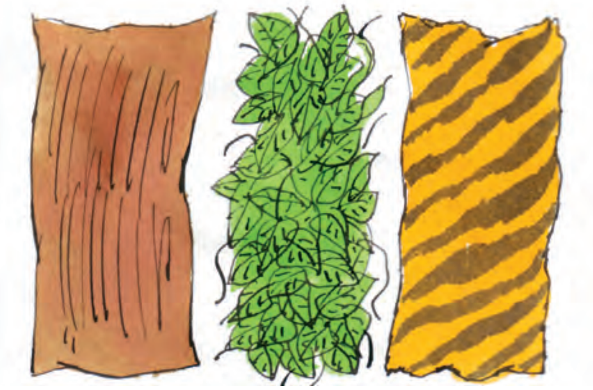

— একসময় কিছুই পরত না। তারপর একবার একটানা অনেকদিন খুব ঠান্ডা পড়ে। যে যা সামনে পায় তাই জড়িয়ে ঠান্ডা থেকে বাঁচার চেষ্টা করে। তখন পশুর ছাল-চামড়া, গাছের ছাল, লতা-পাতা পরা শুরু হয়।

কেতকী বলল— পশুর চামড়া ধুয়ে শুকিয়ে নিত?

ইমরান বলল— মাপমতন কেটে সুচ দিয়ে সেলাই করে নিত?

— কী করে কাটবে? কাঁচিও ছিল না। সুচও ছিল না।

প্রাচীন মানুষের পোশাক

পরিবারের বয়স্কদের ছোটোবেলার পোশাক ও বর্তমান শিশুদের

লোহার কথা জানত না কেউ। শুধু কাঠ ছিল, পাথর ছিল।

ওয়াসিম বলল— ওই চামড়া গায়ে জড়িয়ে রাখত কী করে?

— তোমরা নিজেরাই ভেবে বলো দেখি!

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

মনে করো তোমরা অনেকদিন আগেকার মানুষ। খুব শীত পড়েছে। শীত থেকে বাঁচতে হবে। পশুর চামড়া, গাছের ছাল, লতা-পাতা, এইসব জিনিস ছাড়া কিছুই নেই। কী করে তা পরে বাঁচা যাবে তা আন্দাজ করে নীচে লেখো :

পরার জন্য কী কী থাকতে পারে	মানুষ কীভাবে তা ব্যবহার করে থাকতে পারে
গাছের ছাল, লতা-পাতা,	
পশুর চামড়া,	

পোশাকের আরো গল্প

একসময় মানুষ গাছের ছাল জড়িয়ে পরত। আর এখন কত রকমারি পোশাক। কী করে এমন বদল হলো? মাঝে কী ছিল? গাছের ছাল, পশুর চামড়ার পরে কী এল? সবাই ভাবছে।

ডমরু বলল— লতা বুনে পোশাক হতে পারে।

তিতলি বলল— হ্যাঁ। খেজুরপাতা বুনে যেমন পাটি হয়।

আমিনা বলল— একরকম ঘাস বুনেই তো মাদুর হয়।

রমজান বলল— কিন্তু সেলাই করা শুরু হলো কী করে?

মঙ্গলা বলল— মনে হয় সুচের বদলে কাঠি ব্যবহার করত।

দিদিমণি বললেন—
মৃত পশুর হাড়কে কাঠির মতো ব্যবহার করত।

ভূতনাথ বলল—
হয়তো গাছের শক্ত আঁশই হতো সুতো।

ওদের কথা শুনে দিদিমণি খুব খুশি।
বললেন— প্রথম দিকে এভাবেই হয়েছে। পাট তো গাছের আঁশই। শন নামে আর একরকম গাছ আছে। খুব শক্ত আঁশ।

তিয়ান বলল— শন বুনেও পরত মানুষ?

রিয়াজ বলল— যেমন গামছা বোনে?

— প্রথমে কী আর অত ভালো করে বুনতে পেরেছিল! যা হোক করে জুড়ত।

প্রাচীন মানুষের পোশাক

শীতকালে তিন্নি বিড়ালকে জামা পরিয়ে রাখে। স্কুলে আসার আগে খুলে দেয়। আবার সন্ধ্যায় পরায়। সেকথা শুনে লোকনাথ বলল--- আমরাও পোষা গোরুদের জামা পরাই। চটের জামা। সন্ধ্যায় পরাই। সকালে খুলে দিই।

মঙ্গলা বলল— ওদেরও খুব শীত লাগে, তাই না?

দীপা বলল— শীত ছাড়াও মশা আছে। গোরুরা লেজ দিয়ে মশা তাড়ায়। কিন্তু সারা শরীরে লেজ পৌঁছোয় না। চটের জামা পরালে তেমন মশা কামড়াতে পারে না।

ভূতনাথ বলল— আমার মামারা পোষা টিয়াকেও জামা পরায়।

তিন-চারজন একসঙ্গে বলে উঠল— ইস। তোরা পাখি পুষিস? জানিস না, পাখিদের খাঁচায় রাখতে নেই!

ভূতনাথ থতমত খেয়ে বলল— তাই বুঝি! আমরা না, মামারা পোষে। আচ্ছা, ছোটোমামাকে বলব।

আয়েষা বলল— শীতকালে ছাগলদের খুব কষ্ট। ঠকঠক করে কাঁপে।

ওদের কথা শুনে দিদিমণি বললেন— পশু-পাখিদের

গায়ে লোম বা পালক আছে। তাতে শীত কিছুটা কমে।

তিন্নি বলল— দিদি, শালিখ পাখিরা শীতকালে পালক ফুলিয়ে রাখে।

— বাঃ! সেটাও লক্ষ করেছ। শীত থেকে বাঁচার জন্যই পালক ফুলিয়ে রাখে।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

১। কীভাবে ক্রমে মানুষ ভালো করে পোশাক তৈরি করতে শিখল তা আন্দাজ করে নীচে লেখো :

কী কী উপকরণ ব্যবহার করেছে	মানুষ কীভাবে সেগুলো দিয়ে পোশাক তৈরি করে থাকতে পারে
১) গাছের ছাল, পাতা, লতা	

২। শীত থেকে বাঁচতে তোমার চেনা জানা পশু-পাখিরা কী কী করে তা নীচে লেখো :

পশু-পাখির নাম	শীত থেকে বাঁচার জন্য কী করে	নিজে করে, নাকি অন্যের সাহায্য পায়	কার সাহায্য পায়

বৃষ্টি এল ঝেঁপে

খেলা তখন দশ মিনিটও গড়ায়নি। বিমল সবে তিনজনকে কাটিয়ে একটা গোল দিয়েছে। এমন সময় ঝমঝম করে বৃষ্টি এল। সাহিলরা খেলা দেখছিল। তারা দৌড়ে গিয়ে ঢুকল তিনুর ঠাকুরদার বাড়ি। যারা খেলছিল তারাও চলে এল মিনিট দুইয়ের মধ্যে।

সবাই এসে পৌঁছোতে না পৌঁছোতেই বৃষ্টি থেমে গেল। তারপর সবাই বেরিয়ে এল।

সাহিল বলল— ঠাকুরদা, তোমার বাড়িটা আজ আমাদের বাঁচিয়ে দিল!

ঠাকুরদা হেসে বললেন— কী যে বলো দাদা! বৃষ্টি এল বলেই তো আমার বাড়িতে একবার ঢুকলে!

প্রশান্ত বলল— তা অবশ্য ঠিক!

তিনু নরেনের সঙ্গে পড়ত। গত বছর তিনুর বাবা বদলি হয়ে গেছেন। এই বাড়িতে এখন ঠাকুরদা একাই থাকেন।

নরেন বলল— দাদু, তিনুরা এখন কোথায়?

ঠাকুরদা বললেন— পাহাড়ি অঞ্চলে। ছবি আছে। দাঁড়াও, দেখাচ্ছি।

ঠাকুরদা একটা ছবি দেখালেন। পাহাড়ের গায়ে একটা বাড়ি। সামনে তিনু দাঁড়িয়ে আছে। পাশে গভীর খাদ। তার উপর একটা ছোটো ব্রিজ। তারপর রাস্তা।

স্কুলে এসে নরেন তিনুদের বাড়িটার কথা বলল। সবাই

দিদিমণির কাছে পাহাড়ের বাড়ি নিয়ে জানতে চাইল। দিদি হেসে বললেন— ছবিটা দেখে নিজেরাই আন্দাজ করে বোঝো।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

নিজের বাড়ির ছবি আঁকো। আগের পৃষ্ঠার বাড়িগুলোর ছবির সঙ্গে সেই বাড়ির মিল আর পার্থক্য লেখো:

তোমার বাড়ির ছবি	তোমার বাড়ির সঙ্গে ছবির যে-কোনো বাড়ির মিল/ অমিল	
	মিল	অমিল

সহজ করে বোঝা

স্কুল থেকে ফেরার পথে রেশমা জানতে চাইল— বাড়ির ছবিতে কী কী আঁকলি রে? উঠোন, পাঁচিল, সব?

টিকাই বলল— ওসব আঁকা খুব ঝামেলা। শুধু একদিকের দেয়াল আর চাল এঁকেছি।

শেফালি বলল— দরজা, জানালাও দেখাসনি?

নরেন বলল— ওসব তুই আঁকিস। তুই ভালো আঁকতে পারিস।

পরদিন। ক্লাসে শেফালি নিজেদের বাড়ির একটা আঁকা ছবি দেখাল। বাড়ি, দরজা, জানালা, উঠোন, ফুলের বাগান, সবজি-বাগান, পুকুর। খুব সুন্দর ছবিটা।

তিন-চারজন একসঙ্গে বলল— তুই এঁকেছিস?

শেফালি বলল— আমি এত ভালো পারি? কাকা এঁকেছে।

সবাই জানে শেফালির কাকা ভালো ছবি আঁকেন।

এসব দেখেশুনে দিদিমণি বললেন— এত ভালো যদি সবাই আঁকতে নাও পারো, তবুও কোথায় কী আছে তা সহজেই দেখানো যায়।

অংশু বলল—কীভাবে?

— চিহ্ন ঠিক করে নিতে হয়। যোগ-বিয়োগের যেমন চিহ্ন দিতে হয় তেমনি।

কাজ	চিহ্ন	জিনিস	চিহ্ন
যোগ	+	দরজা	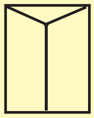
বিয়োগ	−	জানালা	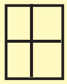

অ্যালিস বলল— দরজা আর জানালার চিহ্ন কেমন হতে পারে? দিদি বোর্ডে এঁকে দেখালেন।

শুভম বলল— বুঝেছি। দেখে বোঝা যাবে, কী জিনিস।

— বোঝা গেলে তো ভালোই। না বোঝা গেলেও অসুবিধা নেই। পাশে লিখে দেবে কোনটা কীসের চিহ্ন। তার আগে সবাই মিলে ঠিক করে নেবে চিহ্নগুলো।

বৈশাখী বলল— উঠোন, ফুলের বাগান, সবকিছুর জন্য চিহ্ন ঠিক করে নেব?

— রান্নাঘর, শোওয়ার ঘর, বাথরুম, বারান্দা, সবকিছুর চিহ্ন ঠিক করে নাও। তাহলে বাড়ির সব কিছু দেখানো যাবে।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

বাড়ি ও তার আশপাশ বোঝাতে কী কী চিহ্ন ব্যবহার করবে তা ঠিক করো। এবার নীচে লিখে আর এঁকে দেখাও :

জিনিস	চিহ্ন	জিনিস	চিহ্ন	জিনিস	চিহ্ন

সহজ একটা মানচিত্র

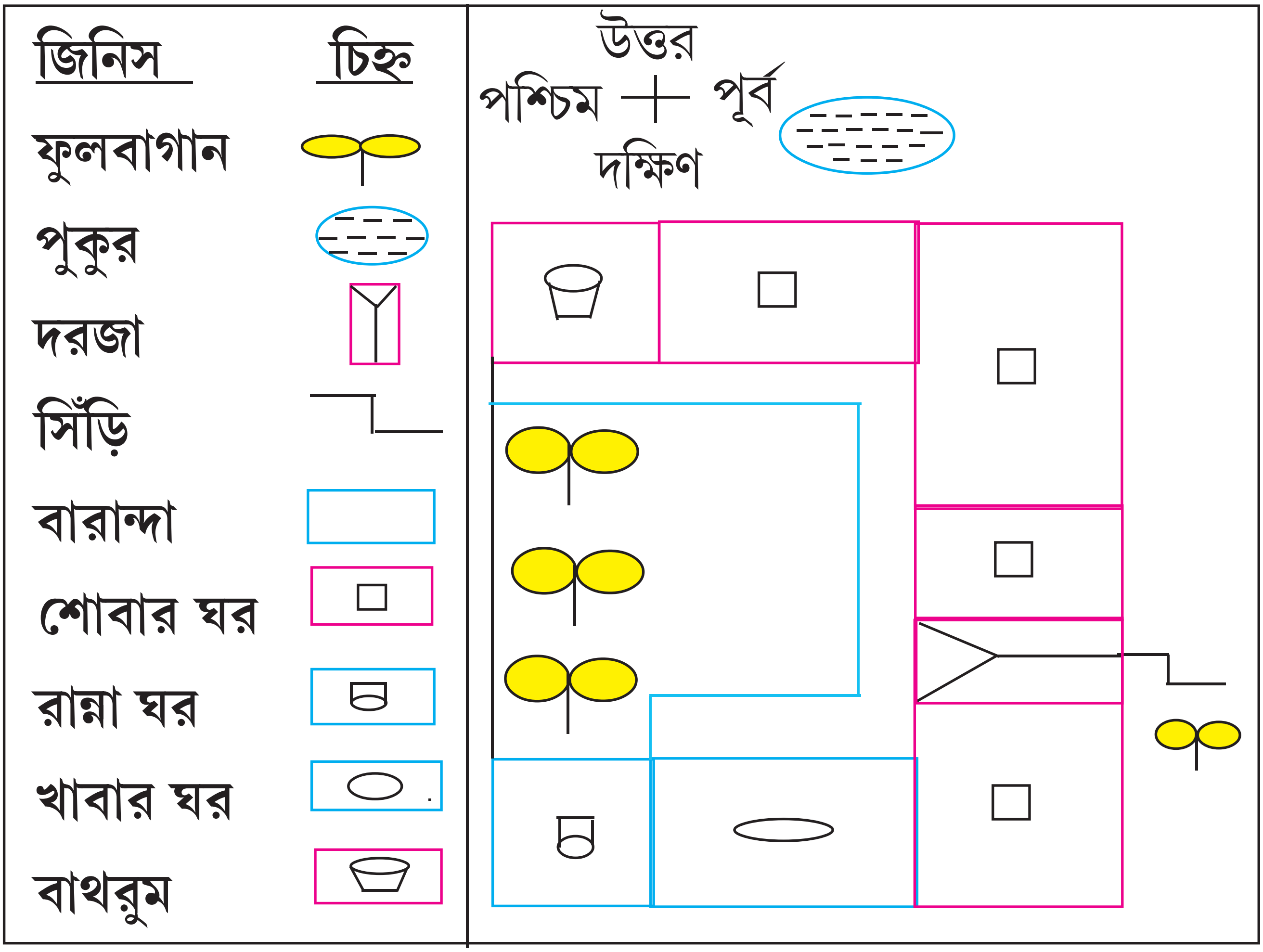

পরের দিন শেফালি নানা চিহ্ন দিয়ে বাড়ির সব কিছু এঁকে দেখাল। দেখতে আগের দিনের ছবিটার মতো সুন্দর নয়। কিন্তু বোঝা যাচ্ছে সব, বরং বেশি। কোথা দিয়ে ঘরে ঢুকতে হবে, তা দেখা যাচ্ছে। ফুলের বাগান কোথায়,

কোন ঘরটা কীজন্য তাও বোঝা যাচ্ছে। ছবির পাশে কোনটা কীসের চিহ্ন তাও দেখিয়েছে।

সবাই ভালো করে দেখল। শেফালি বলল— এটা কিন্তু কাকা আঁকেনি। আমি নিজে এঁকেছি।

দিদিমণি বললেন— এটাকে কি বাড়ির ছবি বলা যাবে?

সবাই ভাবতে লাগল। হঠাৎ সুহাগ বলল--- দিদি, এটাকেই কি ম্যাপ বলে?

অরুণ বলল— তা কি করে হবে? ম্যাপ তো দেয়ালে যেটা টাঙানো রয়েছে।

— ওটা আমাদের রাজ্যের ম্যাপ। এটা হল বৈশাখীদের বাড়ির ম্যাপ বা মানচিত্র।

কেতকী বলল--- রাজ্যের মানচিত্রেও এইরকম চিহ্ন দেওয়া আছে?

— কোনটা কোন জেলা তা এক একটা আলাদা রং দিয়ে দেখানো আছে।

রিঙ্কু বলল— গাছ, পুকুর– এসব তো নেই!

— না ওগুলো নেই। অনেক বড়ো একটা জায়গা ওইটুকু কাগজে দেখানো হয়েছে। একটা গাছ বা পুকুর এত ছোটো যে দেখানো যায় না। একটা জেলা দেখানো যায়। একটু থেমে দিদি আবার বললেন— ম্যাপ কথাটা ইংরাজি। এর বাংলা হলো মানচিত্র। কোন দিকটাকে কাগজের কোনদিকে এঁকেছ সেটা মানচিত্রের উপর দিকে দেখাতে হয়। এ ব্যাপারে সবাই একই নিয়ম মেনে আঁকে।

বৈশাখী বলল— কী নিয়ম দিদি?

— উত্তর দিকটাকে কাগজের উপরের দিকে দেখাতে হয়। সকালের সূর্য তোমাদের বাড়ির কোন দিকে দেখা যায়?

বৈশাখী বলল— গেটের দিকে।

— তাহলে তুমি ঠিকই দেখিয়েছ। ছবির ডান দিক থেকে বাড়িতে ঢোকা দেখিয়েছ। মানচিত্রে ওটাই পূর্বদিক।

এবার পশ্চিমবঙ্গের ম্যাপটা দেখো।

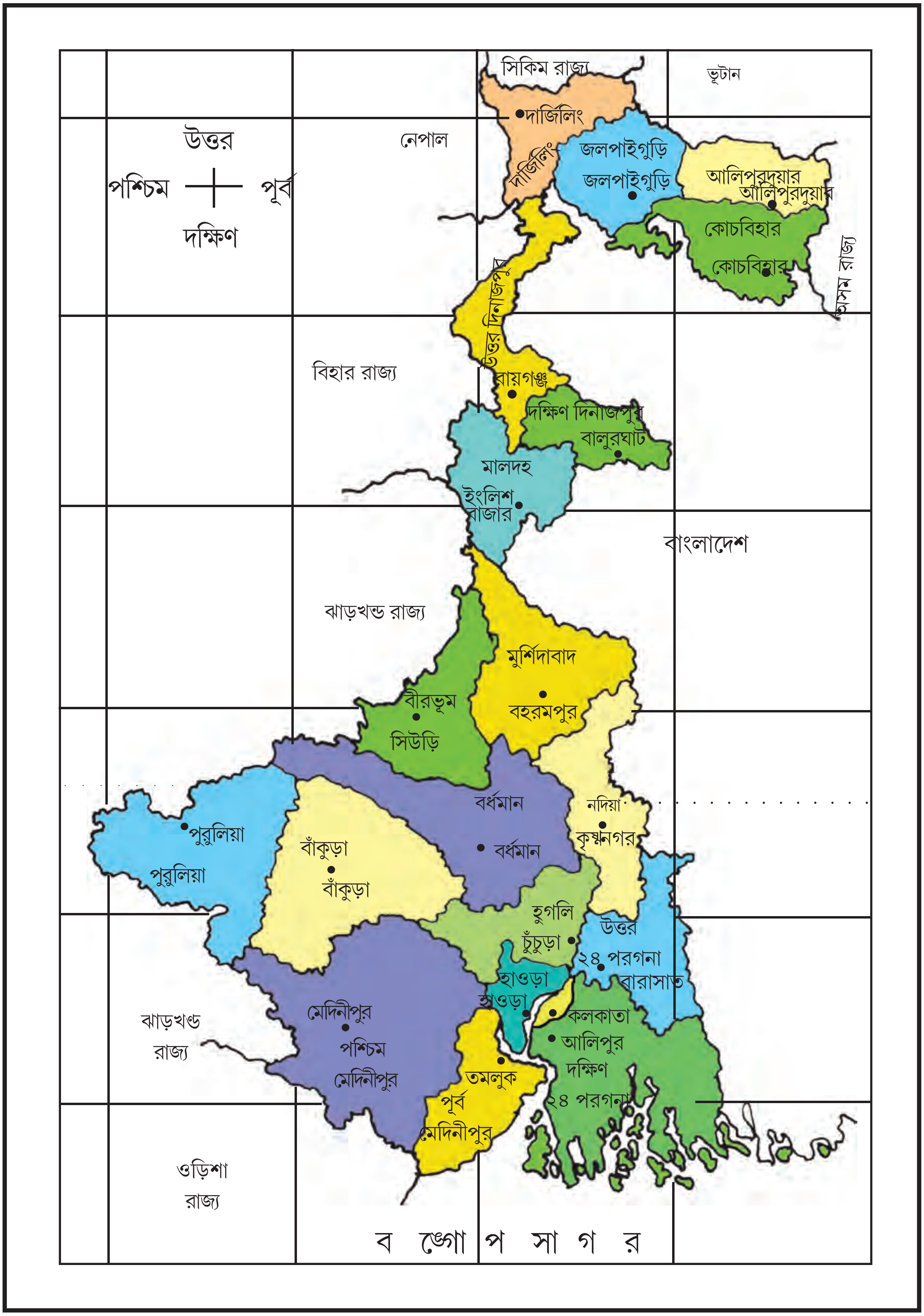

পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্র

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

তোমাদের স্কুলের গেটের কোন দিকে সূর্য ওঠে সেটা দেখো। তারপর স্কুল বাড়িটার একটা মানচিত্র আঁকো:

উত্তর
পশ্চিম — পূর্ব
দক্ষিণ

স্কুল বাড়ির মানচিত্র

মিল-অমিল: নানারকম চিহ্ন

স্কুলের মানচিত্র আঁকা শেষ হতেই ছুটি হলো। সবাই বাড়ি চলল। যেতে যেতে সাহিল ভাবল, বাড়ির আর

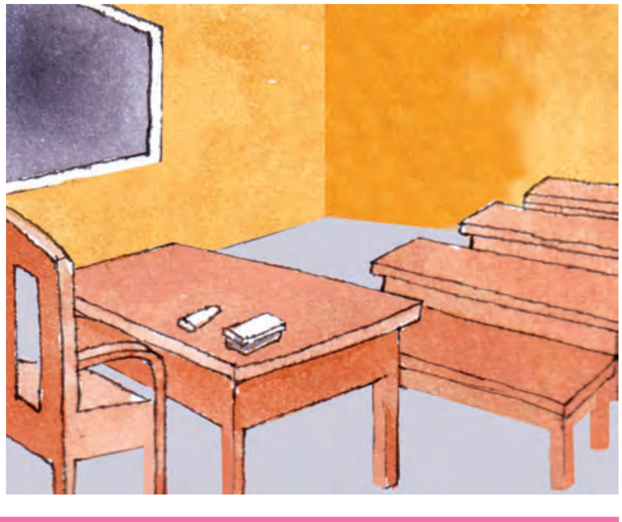

স্কুলের বাইরের দিকটা মোটামুটি একরকম। কিন্তু ভিতরটা অনেক আলাদা।

স্কুলে বেঞ্চ আছে, বোর্ড-চক-ডাস্টার আছে। বাড়িতে তা নেই।

আবার বাড়িতে খাট-বিছানা, আলনা আছে। স্কুলে সেসব নেই।

সাহিল পরদিন স্কুলে দিদিমণিকে বলল--- বাড়ির জিনিসপত্র আর স্কুলের জিনিসপত্র আলাদা। ভিতরের মানচিত্র আঁকতে গেলে আরো অনেক চিহ্ন ঠিক করতে হবে, না দিদি?

দিদি বললেন— ঠিক তাই। যা যা মানচিত্রে দেখানো দরকার সবের জন্য চিহ্ন ঠিক করো।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

১। নিজেদের ঘরের ভিতরের আর স্কুলঘরের ভিতরের জিনিসগুলোর জন্য চিহ্ন ঠিক করে নীচে লেখো :

নিজেদের ঘরের ভিতরের জিনিস	চিহ্ন	স্কুলঘরের ভিতরের জিনিস	চিহ্ন

২। তোমাদের ক্লাসঘরের আর বাড়ির যে কোনো একটা ঘরের ভিতরের মানচিত্র নীচে আঁকো:

ক্লাসঘরের ভিতরের	বাড়ির রান্না / শোবার ঘরের ভিতরের মানচিত্র

মিল-অমিলের আরো কথা

বাড়ি ফেরার পথে তর্ক শুরু হলো। স্কুলের ঘর আর বাড়ির ঘরের মিল বেশি, না অমিল বেশি! হঠাৎ পিকু নাটকের ভঙ্গিতে বলল— বেঞ্চি আর খাট। এই তো তফাত! ভেঙে দেখো দুটোই কাঠ। বাইরে আলাদা, ভেতরে সবই মিল।

পিকুর কথা শুনে সবাই হেসে ফেলল। এবার কেতকী বলল— সে তো পাকা ঘর মানেই ইট, বালি, সিমেন্ট।

আয়েষা বলল— জল না দিলে ইট-বালি-সিমেন্ট জমবে কি?

ওয়াসিম বলল— ইট গাঁথার সময় শুধু নয়। পরেও জল লাগবে।

সাহিল বলল— শুধু পাকা বাড়ির কথা কেন? পরেশকাকুদের মাটির বাড়ির কথা ভুলে গেলি?

ইমরান বলল— ফুফুরা যখন পড়ত তখন স্কুলও মাটির ছিল।

রোজ স্কুলে যাওয়া-আসার পথে কী গল্প হলো সেকথা দিদিমণিকে না বললে ওদের শান্তি হয় না। পরদিনও সব শুনলেন দিদি। তারপর বললেন— এখনও অনেকে মাটির বাড়িতে থাকেন।

হারুন বলল— শুধু মাটি? দিদি, অনেক বাড়ি আছে দরমা দিয়ে ঘেরা।

রেবা বলল— কঞ্চির বেড়া তৈরি করে তার উপর মাটি লেপেও দেয়াল করে। তাকে বলে ছিটে বেড়ার দেয়াল।

প্রকাশ বলল— একরকম পাতা সাজিয়ে সাজিয়ে ঘরের চাল করা যায়। আমি ছবিতে দেখেছি।

দিদি বললেন— তাহলে দেখো, তোমরা কত জানো! বাড়ির কতরকমের দেয়াল আর চালের কথা বলতে পারলে। কী কী দিয়ে সেগুলো তৈরি করে তাও জানো।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

বাড়ি তৈরির বিষয়ে আরো আলোচনা করো। তারপর নীচে লেখো ও আঁকো :

বাড়ির দেয়াল তৈরির জিনিস	বাড়ির চাল/ছাদ তৈরির জিনিস	বাড়ির ছবি

মানুষ যা গড়েছে

বিকেলে মাঠে চারজন গল্প করছে। কুহেলি, সাইনা, রাবেয়া ও টিকাই।পাতা দিয়ে বাড়ির চাল তৈরির কথা বলল কুহেলি। টিকাই বলল— আমার দাদু বলে, এইসবই তো আগে ছিল! বাঁশ-কঞ্চি, তাল-খেজুরের গুঁড়ি,

বাড়ি তৈরিতে ব্যবহৃত উপাদান

মাটি, বালি, খড়, নানারকম পাতা। টালি, টিন, অ্যাসবেস্টস, ইট, লোহা, সিমেন্ট এসব তো মানুষ পরে তৈরি করেছে।

সাইনা বলল— পাথর তো আগে থেকেই ছিল। মানুষ তৈরি করেনি। পাথরের উপর পাথর বসিয়ে বাড়ির দেয়াল তৈরি করে। জোড়মুখে একটু সিমেন্ট-বালি লাগায়। হরেনকাকু বলেছেন।

রাবেয়া বলল— হ্যাঁ। পাথর কেটে ছোটোবড়ো ইটের আকার দেয়। পাহাড়ি দেশে পাথর দিয়ে ইটের কাজ সারে।

পরদিন স্কুলে গিয়ে ওরা চারজন এসব বলতেই আয়েষা বলল— জলের পাইপ, টিউবওয়েল কী আগে ছিল নাকি? মানুষই তৈরি করেছে।

ডমরু বলল— বেসিন, জলের কলও তাই।

কেতকী বলল— ইলেকট্রিক তার, বালব, ফ্যান।

দিদিমণি ওদের কথা শুনছিলেন। এবার বললেন— বাড়ি তৈরি করা আর তাকে সুন্দর করার জন্য আরো অনেক কিছু তৈরি করেছে মানুষ! তবে তার অনেক উপাদানই

প্রকৃতি থেকে পাওয়া।

বৈশাখী বলল— মানুষ বুদ্ধি করে সেগুলো বদলে নিয়েছে।

ঘরবাড়ির যুক্তি-তর্ক

একসঙ্গে অনেকে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছে। হঠাৎ জেকব বলল— আচ্ছা, বাড়ির কোনটা বেশি দরকারি? ছাদ, না মেঝে, না দেয়াল, না জানালা-দরজা, নাকি অন্য কিছু? একটু ভেবে তনয়া বলল— জানালা না থাকলে দম আটকে যাবে।

ডমরু বলল--- ছাদ না থাকলে বৃষ্টিতে মুশকিল! ঘুমোচ্ছিস, জেগে দেখলি ঘরের মধ্যে জল থই থই।

সাহিল বলল— দেয়াল লাগবে না? ঘুম ভেঙে উঠে দেখবি রান্না করা খাবার সব বিড়াল-কুকুরে শেষ করেছে।

আমিনা বলল— দরজা না থাকলে তো ভিতরে ঢুকতেই পারবি না।

তনয়া বলল— আবার মেঝে না থাকলে ঘরে জল ঢুকে যায়।

পরদিন এসব শুনে দিদিমণি বললেন— একটা করে ভাবো। কী কী কারণে বাড়িতে সেটার দরকার। ছাদ বা বাড়ির চাল-এর কথা ধরো। কতরকমের ছাদ হয়। আগে ছিল কড়িবরগার পেটানো ছাদ। এখন ঢালাই ছাদ। কারো আবার বাড়ির চাল টালি বা খড় দিয়ে ছাওয়া। তবে ছাদ কী শুধু বৃষ্টি আটকায়?

সাইনা বলল— না দিদি। গরমের দিনে চড়া রোদও আটকায় ছাদ।

— বাড়িতে যা যা থাকে তার সবই দরকার। তবে যেটা না হলে চলবেই না, সেটা মানুষ আগে করেছে।

জেকব বলল— হ্যাঁ দিদি, আগে মাটির বাড়ি হয়েছে। মাটির বাড়ি দেখতে হবে। বোঝা যাবে কোনটা বেশি দরকার।

— যে যা দেখেছ তা ভালো করে ভাবো। অনেকটা বুঝতে পারবে। যাদের মাটি বা দরমার বাড়ি তারা বেশি ভালো বলতে পারবে। বাকিরাও নানারকম বাড়ি দেখে বোঝার চেষ্টা করো, কোনটা বেশি দরকার।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

১। নিজেদের বাড়ির বিভিন্ন অংশ ভালো করে দেখো। সেই অংশগুলো তৈরি করতে প্রকৃতি থেকে সরাসরি কোন কোন জিনিস কাজে লাগানো হয়। আজকাল তার বদলে কী কী ব্যবহার করা হয়? এবার নীচে সেসব লেখো :

বাড়ির বিভিন্ন অংশ	প্রকৃতি থেকে সরাসরি কাজে লাগানো জিনিস	তার বদলে কী কী কাজে লাগানো হয়
দেয়াল	বাঁশ, তাল-খেজুরের গুঁড়ি , মাটি	ইট, বালি, সিমেন্ট
মেঝে	মাটি	
চাল/ ছাদ	জল-বালি-সিমেন্ট -পাথরেব কংক্রিট, টিন	
জানলা		
দরজা		

২। তোমরা নানান রকম বাড়ি দেখেছ। সেসব বাড়ির নানান অংশের নাম নীচে রয়েছে। সেই অংশগুলো কেন দরকারি ? এসব নিয়ে তোমাদের ভাবনা নীচে লেখো :

বাড়ির অংশের নাম	কেন দরকার
দেয়াল	
মেঝে	
চাল/ ছাদ	
জানালা, দরজা, গ্রিল	

নির্মাণ-শিল্পের কথা ও কাহিনি

তপনের বাবা কাঠের কাজ করেন। বাড়ি তৈরির সময় জানালা-দরজা লাগাতে যান। একটা পাকা বাড়ি তৈরির সময় তপন বাবার সঙ্গে দেখতে গিয়েছিল।

সেখানে অনেক লোক। কেউ চৌবাচ্চায় ইট ফেলছেন। কেউ ভেজা ইট তুলে তুলে এগিয়ে দিচ্ছেন। কেউ কোদাল দিয়ে বালি-সিমেন্ট-জল মাখছেন।একজন আবার দেয়ালে জল দিচ্ছেন। বাবা বলেছিলেন— এঁরা জোগানদারের কাজ করছেন।

একজন হাতে কর্নিক নিয়ে ইট গাঁথছিলেন। একজন ওলনদড়ি ধরে গাঁথনি ঠিক হয়েছে কিনা দেখছিলেন।

একজন সরু তার দিয়ে রডের খাঁচা বাঁধছিলেন। বাবার মুখে তপন শুনেছে ওঁরা রাজমিস্ত্রি।

দরজা-জানালার পাল্লা লাগাতে নানারকম করাত, বাটালি, অন্য অনেক যন্ত্র লাগে। সেসব তপনের চেনা। কিন্তু ও কখনও মাটির বাড়ি তৈরি করা দেখেনি। ওর জন্মের আগে ওদের বাড়ি তৈরি হয়ে গিয়েছিল। কলঘরটা পাকা। আর সব ঘরের দেয়াল মাটির, চাল টিনের।

ডমরু বলল— সাগিনদের পাড়ায় একটা মাটির ঘর তৈরি হচ্ছে। একদিন দেখে এলেই হয়।

পরদিনই ওরা সবাই একটু ঘুরে মাটির ঘর তৈরি করা দেখে স্কুলে গেল।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

নানারকমের ঘর তৈরি করতে নানারকমের সহযোগিতামূলক কাজ করতে হয়। সেসব কাজের বিষয়ে আলোচনা করে নীচে লেখো:

বাড়ি তৈরির কাজ	অনেকে মিলে যেসব কাজ করা হয়	যাঁরা কাজ করেন তাদের কাকে কী বলা হয়
১. দেওয়াল তোলা		
২. ঘরের চাল ছাওয়া	বাঁশ বা কাঠ কাটা, কাঠামো তৈরি, চালের কাঠামো বসানো, খড় দেওয়া	ঘরামি
৩.		
৪.		

বাড়িতে কত কিছু

বোতলে খাবার জল ভরতে ভরতে অলিভিয়া ভাবল, বাড়ি তৈরি করতে আরও লোক লাগে।

আমাদের বাড়িতে আরো কত্তো কী রয়েছে! বারান্দার গ্রিল, দেয়াল-আলমারি, জলের পাম্প। বাবা কি জানে কতো লোক মিলে এসব করেছে! বাবাকে বলতেই বাবা খুব হাসলেন। তারপর বললেন— বাড়ি তৈরির সময় দেখা যায় না, এমন অনেক লোকও লাগে। জানালার কাচ যাঁরা তৈরি করেছেন, তাঁরাও বাড়ি তৈরির কাজই করেছেন।

জল তোলার পাম্প যাঁরা তৈরি করেছেন তাঁদেরও এর মধ্যে ধরতে হবে। আবার বাড়ি করার আগে একটা নকশা করতে হয়। কোথায় কোন ঘর থাকবে? কোন দিকে

দরজা-জানালা রাখলে ভালো হবে। অলিভিয়া বলল— ভালো হবে মানে?

---ঘরে ঢোকা-বেরোনোর সুবিধে হবে। শোওয়ার খাট, আলমারি, বইয়ের তাক রাখার সুবিধে হবে।

পরদিন অলিভিয়া স্কুলে এসব বলতেই দিদিমণি বললেন--- তাহলে বাড়িতে কত কিছু থাকে জানা হয়ে গেল। কত লোক মিলে কাজ করেন তাও তোমাদের জানা হয়ে গেল।

একথা শুনে ডমরু, কেতকী, সুধন, রবীনরা নিজেদের বাড়িতে কী আছে তা বলতে লাগল।

— আমাদের বাড়িতে মাটির কলসি আছে। ওই কলসিতে জল রাখা হয়। গরমকালে জল খুব ঠান্ডা থাকে।

— আমাদের বাড়িতে একটা বই রাখার আলমারি আছে। বাবা চায়ের পেটির কাঠ দিয়ে বানিয়েছে। কাকার মোটামোটা বই থাকে সেখানে।

— আমাদের বাড়ির চাল টিনের। বাড়ির ভিতরে একটা টিউবওয়েল আছে।

— আমাদের বাড়িতে একটা ধানঝাড়া মেশিন আছে।

— আমাদের বাড়ির কাছেই মাঠ। কিন্তু বাড়িটা অনেক উঁচু জায়গায়।

একথা শুনে অলিভিয়া বলল— বাবা বলেন, একটু উঁচু জায়গায় বাড়ি করতে হয়। যাতে বন্যার জল ঘরে না ওঠে! চাষের জমি আর বাড়ির জমি আলাদা।

দিদিমণি বললেন— তোমার বাবা ঠিক বলেছেন।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

নানা ধরনের বাড়ি তৈরি করতে কী কী লাগে, বাড়ির ভিতর কী কী থাকে নীচে লেখো :

কী ধরনের বাড়ি	বাড়ি তৈরি করতে কী কী লাগে	বাড়ির ভিতর কী কী থাকে
পাকা বাড়ি	ইট, সিমেন্ট, বালি, জল, পাথরকুচি, লোহা কাঠ, টিন, রং	
কাঁচাবাড়ি		

বসতবাড়ির আশপাশ

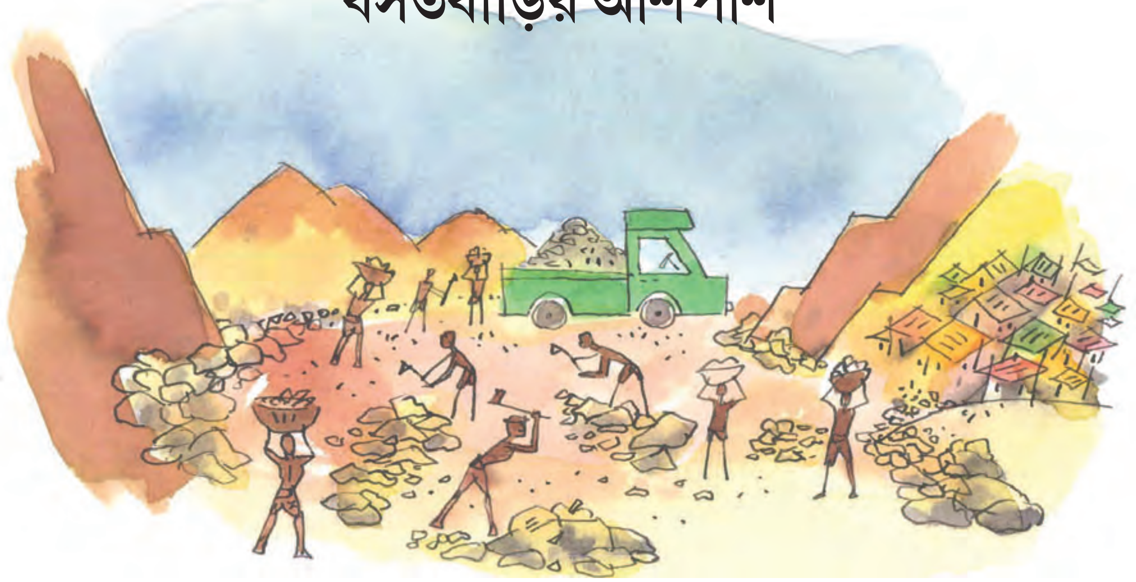

বাড়ি করতে তো আলাদা উঁচু জমি লাগে। কিন্তু পাশে যদি নদী থাকে? নদীর তো পাড় ভেঙে যায়!

আবার পাশে যদি বড়ো রাস্তা থাকে? সারাদিন বাস-লরি যাবে। ধুলোয় ঘর বোঝাই হবে। আর শব্দও হবে খুব। ভারী লরি দিনরাত বাড়ি কাঁপিয়ে যাবে।

বাজারের গায়ে বাড়ি হলে? হইচই হবে খুব। দুপুরের পর বাজে গন্ধও আসবে।

এইসব ভাবতে ভাবতে স্কুলে যাচ্ছিল অনন্যা। পথে দেখা

লক্ষ্মীমণির সঙ্গে। এসব শুনে লক্ষ্মীমণি ওদের দেশের বাড়ির কথা বলল। চারপাশে খাঁ খাঁ মাঠ। কাছেই পাথরের খাদান। সারাদিন পাথরের গুঁড়ো উড়ে আসে। পাশে ছোটো রাস্তা। কখনও জল দাঁড়ায় না। কিন্তু রাস্তা দিয়ে লরি ঢোকে। খুব ধুলো ওড়ায়। ওর ঠাকুরদা ওই খাদানে কাজ করেন। বাবাকে বলেছিলেন অন্য জায়গায় কাজ খুঁজতে। রিম্পা বলল— আমার দাদুদের বাড়িতে হাতির খুব উৎপাত।

স্কুলে দিদিমণি সব শুনলেন। অন্যরাও শুনল।

পিকু বলল— খাঁ খাঁ মাঠে বাড়ি হলে খুব মুশকিল। বাড়ির পাশে গাছপালা থাকা দরকার। একটু ছায়া হয়।

আয়ুব বলল— বাড়ির কাছে জলের স্তর পাওয়া চাই। নইলে কল বসানো যাবে না। খাওয়ার জল আনতেই দিন কেটে যাবে।

দিদিমণি বললেন— কাছে পিঠে কী কী থাকলে বাড়ির পক্ষে ভালো সেসব তাহলে বোঝা গেল।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

তোমাদের যার যেখানে বাড়ি সে সেখানকার কথা ভালোভাবে জানো। সেসব কথা নীচে লেখো:

কোন জায়গার বাড়ি	কী কী থাকলে সেখানে বাড়ি করা ভালো	কী কী থাকলে সেখানে বাড়ি করা অসুবিধা

বাড়ির গায়ে ঝড়ঝাপটা

নদীর পাড় ধসে বাড়ি পড়ে গেলে খুব মুশকিল! নদীর যে পাড় ভাঙছে সেই পাড়ে বাড়ি করা যাবে না। ভূমিকম্প হলেও খুব সমস্যা।

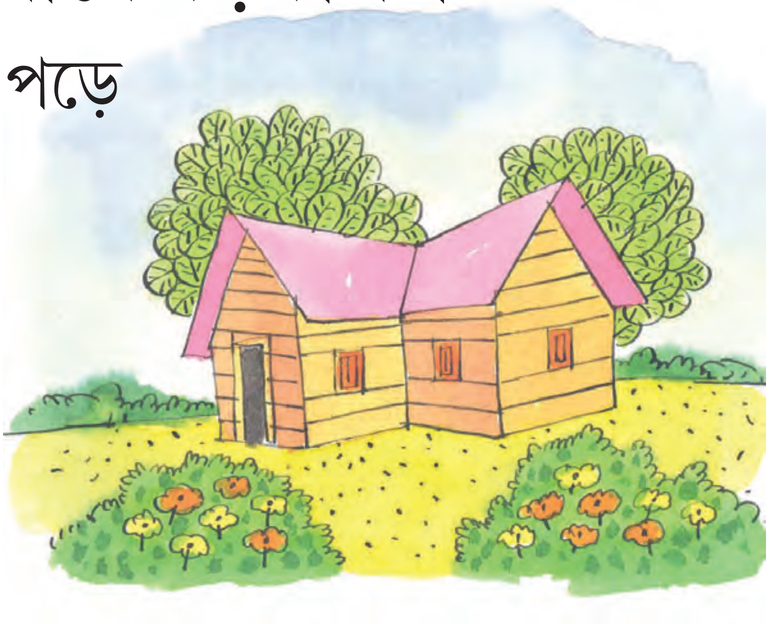

বাড়ি ফেটে যায়। ইট-সিমেন্টের বাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। যেখানে বেশি ভূমিকম্প হয় সেখানে কাঠের বাড়ি করলে কিছুটা সুবিধা। চালটা টিনের হলে ভালো। সেই কাঠ আর টিন দিয়ে আবার নতুন বাড়ি করে নেওয়া যায়।

যেখানে মাটির নীচ থেকে কয়লা তোলা হয় সেখানেও ধস নামে। বাড়ি বসে যায়। কয়লা তুলে কয়লার খাদ বালি দিয়ে ভালো করে বুজিয়ে দিতে হয়। ওইসব জায়গায়ও হালকা কাঠ ও টিন দিয়ে বাড়ি করলেই ভালো হয়।

মরিয়ম ওর মেসোমশায়ের কাছে এসব শুনেছে। উনি কয়লাখনিতে কাজ করেন। মরিয়মদের গ্রামে বন্যা হয়। তাই আজকাল সবাই মেঝেটা খুব উঁচু করছে। পাকা বাড়ি করলে একতলায় ঘরই করছে না। কয়েকটা পিলারের উপর ছাদ ঢালাই করছে। তার উপর দোতলায় থাকার ঘর করছে।

রূপকের দাদু থাকেন সাগরের কাছে। সেখানে খুব জোরে

ঝড় হয়। তাঁদের পাকা বাড়িও একতলা। ঝড়ে উঁচু বাড়ির বেশি ক্ষতি হয়।

সব গল্প শুনে দিদিমণি বললেন— তবে দরকার হলে খুব শক্তপোক্তভাবে উঁচু বাড়িও করা যায়।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চলে বাড়ি করায় ক্ষতি বিষয়ে আলোচনা করে লেখো:

কোন অঞ্চলের বাড়ি	কী কী দুর্যোগ হতে পারে	কী কী ক্ষতি হতে পারে	কী কী সাবধানতা নেওয়া যায়

খোলা আকাশের নীচে

ঝড়ে ঘর পড়ে যায়। বন্যায় ঘরে জল উঠে আসে। তখন ঘরবাড়ি ছেড়ে যেতে হয়। বড়োঠাকুমাদের তিনবার এমন যেতে হয়েছে। শেষবার যখন গেছেন, তখন কেতকীর বাবা ছোটো। সেবার

হাইস্কুলের দোতলায় থাকতে হয়েছিল কুড়ি দিন। কেতকী শুনে অবাক। পরদিন স্কুলে সবাইকে বলল এই কথা।

দিদিমণি বললেন— এ তো শুধু ঝড়-বন্যার জন্য! অনেক কাল আগেকার মানুষদের কী করতে হতো জানো?

হামিদ বলল— জানি, দিদি। গুহায় থাকত। এখনকার মতো ঘরবাড়ি ছিল না।

— ঠিক বলেছ। তবে গুহাতেও শান্তি ছিল না। কিছুদিন পরে সেখানে খাবার ফুরিয়ে যেত।

— তখন অন্য জায়গায় চলে যেতে হতো?

— হ্যাঁ। এভাবে ঘুরে বেড়ানোর জীবনকে বলে যাযাবর জীবন। অল্প কিছু জিনিসপত্র আর পোষা পশুদের নিয়ে বেরিয়ে পড়ত তারা। মাসের পর মাস হেঁটে ঘুরত।

— রাতে থাকত কোথায়?

— খোলা আকাশের তলায় থাকত। গাছতলায়ও থাকত। ছোটোখাটো গুহা পেলে থাকত। আবার তাঁবুতেও থাকত।

— তাঁবু কী করে করত? কাপড় তো ছিল না!

— পশুদের চামড়া জুড়ে তাবু তোর করত। বাচ্চাদের তাঁবুর ভিতর রাখত। আর বড়োরা বাইরে পালা করে পাহারা দিত।

— পাহারা কীসের জন্য?

— যাতে অন্য দলের মানুষরা এসে ছাগল-ভেড়া নিয়ে যেতে না পারে। তাছাড়া বাঘ-সিংহের ভয় আছে।

— কেন? বন থেকে দূরে তাঁবু তৈরি করত না কেন?

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

দুর্যোগে পড়ে কীভাবে মানুষ থাকার জায়গা বদলেছে সে বিষয়ে তোমার ধারণাগুলো নীচে লেখো :

আগেকার মানুষ কেন বারবার থাকার জায়গা বদলাত	জায়গা বদলাতে কী কী অসুবিধে হতো

আগের দিনের কথাই অণিমার মাথায় ঘুরছিল। দিদিমণি ক্লাসে আসতেই সে বলল— বাঘ-সিংহরা সুযোগ পেলেই মানুষদের খেয়ে নিত, তাই না?

— সেই ভয় তো ছিলই। তাছাড়া ওইসব গুহা বা বন-জঙ্গল তো বাঘ-সিংহদেরও থাকার জায়গা!

রফিক বলল— বাঘ-সিংহরাও ঘরবাড়ি চায়!

বৈশাখী বলল— সবাই চায়। মৌমাছিরা থাকার জন্য চাক তৈরি করে দেখিসনি?

রবীন বলল— পাখির বাসা। এক এক পাখি এক একরকম বাসা করে।

অ্যালিস বলল— মেঠো ইঁদুরের বাসা দেখেছিস। আমি দেখেছি। আবার পিঁপড়ের চাক, উইঢিবিও তো বাসা।

দিদি বললেন— বাঃ! তোমরা তো অনেক পশুপাখি, পতঙ্গের ঘরবাড়ি বিষয়ে জানো দেখছি।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

পশু-পাখি, পতঙ্গদের ঘরবাড়ি নিয়ে যা কিছু তোমরা জানো নীচের খোপে সেসব লেখো:

পশু-পাখি, পতঙ্গের নাম ও তার বাসস্থানের নাম	বাসস্থানের ছবি	কী কী দিয়ে তৈরি	কোথায় দেখা যায়

পরিবার ও পরিবারের শাখাপ্রশাখা

সুমনার আজ খুব আনন্দ। ছোট্ট ভাইকে নিয়ে ঠাকুমা, কাকা আর কাকিমা এসেছেন। সুমনা এবার দিদি হয়ে উঠল!

ক্লাসে এসে সুমনা এসব বলল। শুনে দিদিমণি বললেন--- মানে, তোমাদের পরিবারে একজন বাড়ল।

হামিদ বলল— পরিবার মানে?

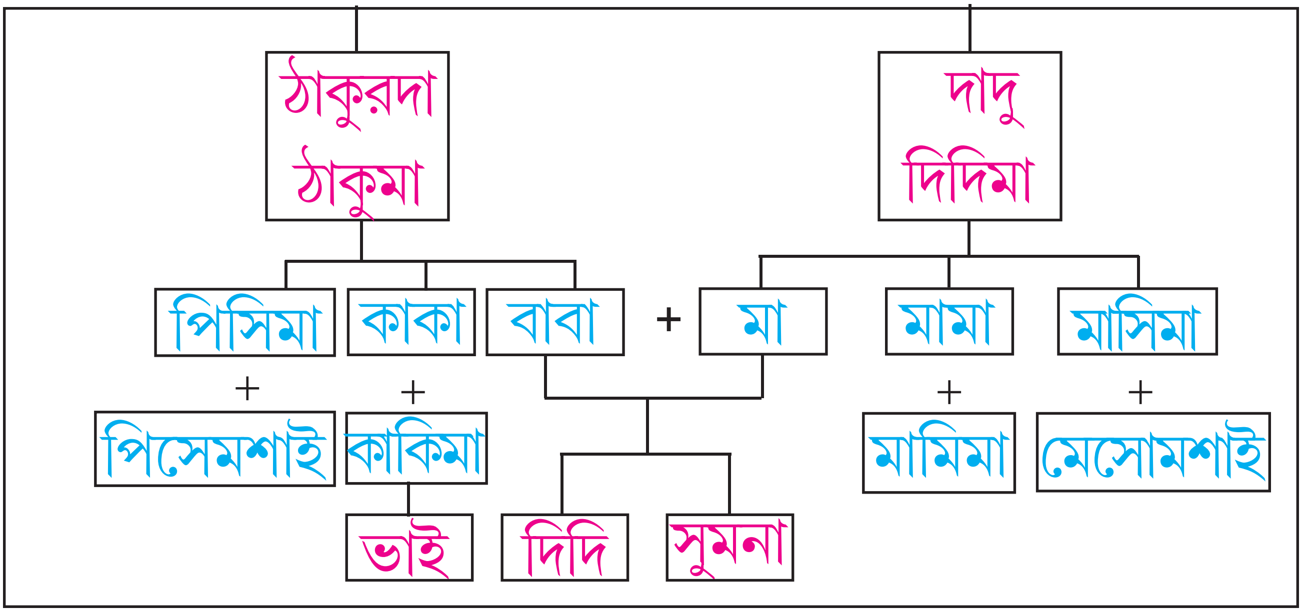

তিতলি বলল— জানিস না? বাড়ির সবাই মিলে পরিবার হয়।

দিদিমণি বললেন— তা বলতে পারো।

চয়ন বলল— সুমনাদের পরিবারে ওর ঠাকুরদা সবচেয়ে বড়ো? ঠাকুরদাকে দিয়ে পরিবার শুরু?

— এখন ঠাকুরদা, ঠাকুমা সবচেয়ে বড়ো। আগে ওঁদের বাবা-মা ছিলেন। এবার তাহলে ঠাকুরদা-ঠাকুমা থেকে শুরু করে পরিবারের শাখা-প্রশাখা কীভাবে দেখাতে হয় দেখো।

এই বলে দিদি বোর্ডে লিখতে শুরু করলেন। সুমনাকে বললেন —তোমার বাবা আর মায়েরা কয় ভাই-বোন?

— বাবা, কাকা, পিসি। আর মায়েরা তিন ভাই-বোন। মা, মামা আর মাসি।

— আর তোমরা?

— দিদি আর আমি। আর আজ কাকিমা ছোটো ভাই নিয়ে এল!

এর মধ্যে দিদি বোর্ডে অনেকটা লিখে ফেললেন। বললেন— এই হলো সুমনাদের পরিবারের শাখা-প্রশাখা।

দেখে বুঝে নাও।

সবাই দিদির লেখাটা মন দিয়ে দেখল।

খানিক পরে সানিয়া বলল— দিদি, আমাদের পরিবারের শাখা-প্রশাখা লিখে দেখাব?

— নিশ্চই দেখাবে!

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

পরিবারের শাখা-প্রশাখা লেখা নিয়ে আলোচনা করো। তারপর নিজের পরিবারের শাখা-প্রশাখা লেখো:

পরিবারের শাখা-প্রশাখা ও নিকট আত্মীয়

সানিয়া নিজেদের পরিবারের শাখা-প্রশাখা লিখে দেখাল। দাদা-দাদি সবার চেয়ে বড়ো। ওরা নিজেরা দুই ভাইবোন। সুমনা বলল— দিদি, কাকার বিয়ের পরে কাকিমা আমাদের পরিবারের সদস্য হলেন।

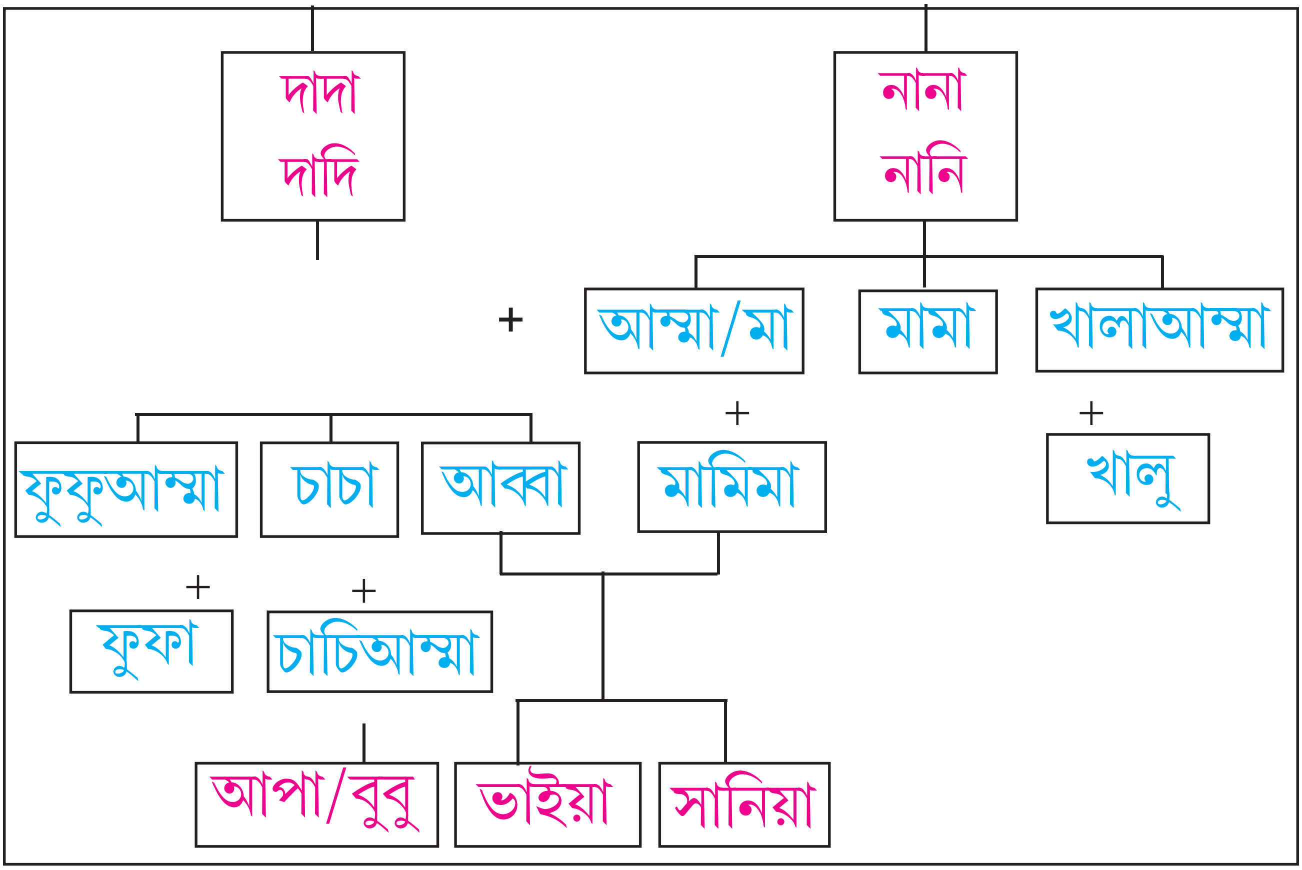

— এভাবেই নতুন পরিবার গড়ে ওঠে।

চিন্ময় বলল— আচ্ছা দিদি। আমার মাসি আছেন। মাসির ছেলে সৌম্য। আমার খুব বন্ধু। কলকাতায় থাকে। আমাদের পরিবারের শাখা-প্রশাখায় ওদের নাম থাকবে?

— রাখতে পারো। তবে সেভাবে লিখতে গেলে পরিবারের শাখা-প্রশাখাটা খুব বড়ো হয়ে যাবে। তুমি ওদের নিকট আত্মীয় বলতেও পারো।

অণিমা বলল— তাহলে পিসিমার ছেলেমেয়েরাও নিকট আত্মীয়?

রুহুল বলল— মামার ছেলেমেয়েরাও তাই?

— এঁরা নিকট আত্মীয়। তবে পরিবারের শাখা-প্রশাখাতে এঁদের কথা লিখতে পারো।

মানস বলল— বুঝেছি। আমি মামাতো, মাসতুতো, পিসতুতো ভাই-বোনদের নিকট আত্মীয়ই বলব।

নাম দিয়ে পরিবারের শাখা-প্রশাখা

তুফানের দিদি একটা বই পড়ছিল। ছোটো ছোটো লেখায় পাতা জোড়া পরিবারের শাখা-প্রশাখা। শুরুতেই লেখা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরি। নামটা তুফানের চেনা। *টুনটুনির বই* এঁরই লেখা। একটু নীচে আর একটা নাম — সুকুমার রায়। ইনিই তো *আবোল-তাবোল* লিখেছেন! চেনা চেনা নাম দেখে তুফান মন দিয়ে দেখল।

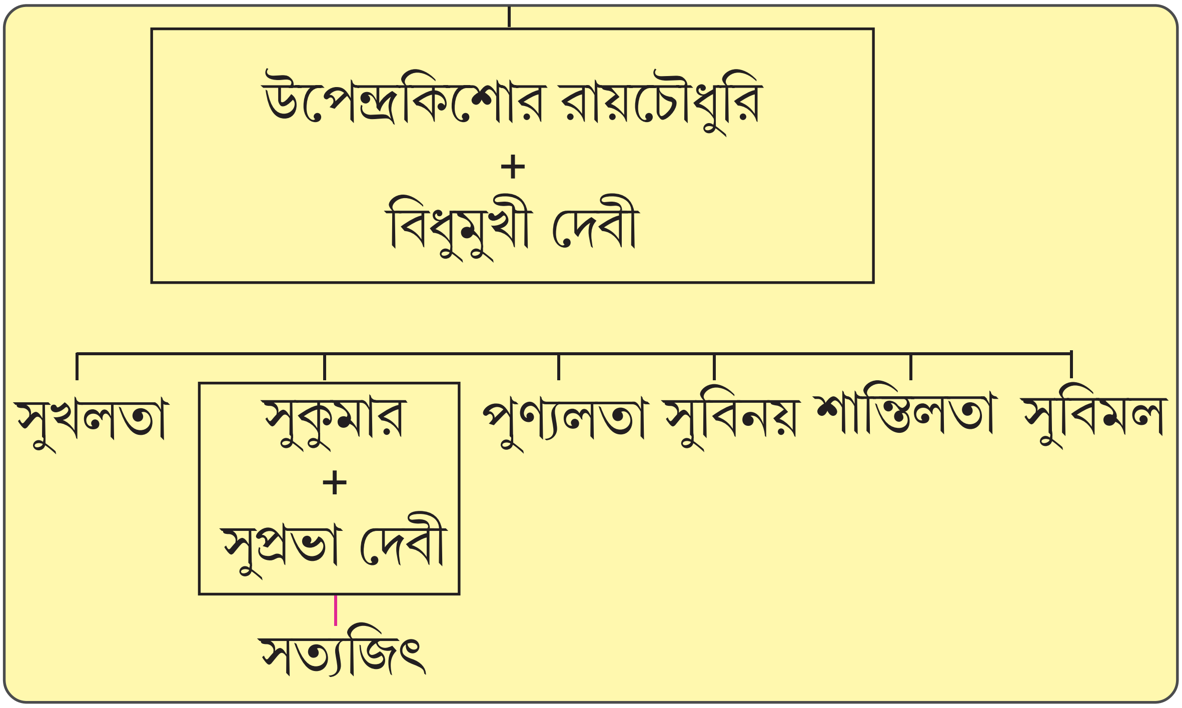

উপেন্দ্রকিশোর ও বিধুমুখী দেবীর ছয় ছেলে-মেয়ে। সবার বড়ো সুখলতা। তারপরে সুকুমার। সুকুমারের আরও চার ভাই-বোন। সুকুমার ও সুপ্রভা দেবীর একমাত্র ছেলে সত্যজিৎ রায়। এই নামটাও তো তুফান জানে! ফেলুদার গল্পগুলো আর সিনেমায় গুপি গাইন বাঘা বাইন ওর খুব প্রিয়।

স্কুলে গিয়ে তুফান বলল সব। শুনে দিদিমণি বললেন— এভাবেই নাম দিয়ে পরিবারের শাখা-প্রশাখা লিখে দেখাতে হয়। তুমি যেটা দেখেছ সেটা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরির পরিবারের শাখা-প্রশাখা।

তুফান বলল— কিন্তু দিদি একটাই কেন? বাকিদেরটা কোথায়?

— বাকিদেরটা দেখানো হয়নি। তুমি ওঁদের পরিবারের শাখা-প্রশাখাটা বোর্ডে লিখে দেখাও।

তুফান লিখল। সেটা দেখে কেতকী বলল— আমরাও নাম দিয়ে নিজেদের পরিবারের শাখা-প্রশাখা করব।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

১) নাম দিয়ে নিজের পরিবারের শাখা-প্রশাখা তৈরি করো :

২) তোমাদের নিকট আত্মীয়দের সম্পর্কে নীচে লেখো:

নিকট আত্মীয় (নাম ও সম্পর্ক)	কোথায় থাকেন

সকলের তরে সকলে আমরা

স্কুলে যাওয়ার সময় কেয়া দেখে বাগানে ভাইয়ের হাতে প্লাস্টিকের ব্যাট। ঠাকুমা বল ছুঁড়ছেন। বল কুড়োচ্ছেন।

কেয়া বলল— এই ভাই! ঠাকুমাকে আবার খাটাচ্ছিস?

ভাই বলল— বাঃ! আমি তো একটু পরেই ঠাকুমার পাকা চুল তুলে দেব!

পরদিন স্কুল থেকে ফিরল কেয়া। তার গলা

শুনেই ঠাকুমা ডাকলেন--- দিদিভাই, সুচে সুতোটা পরিয়ে দাও তো।

কেয়া ঠাকুমার ঘরে গেল। ঠাকুমা সেখানে বসেই কাঁথা সেলাই করছেন। সুচে সুতো পরিয়ে দিতে দিতে কেয়া বলল— কোমরে আর পিঠে ব্যথা হলে কিন্তু আমি জানি না!

ঠাকুমা হেসে বললেন— তোমার বাবা কত চাদর-কম্বল কিনল তো? কিন্তু শীতের শুরুতে আর শেষে তোমার ঠাকুরদা ঠিক কাপড়ের কাঁথা চাইবে। কাঁথা না করলে হয়! ব্যথা হলে তুমি একটু মালিশ করে দেবে!

এমন সময় ঘরে ফোন বেজে উঠল। ঠাকুমা বললেন— যাও, ফোনটা ধরো। বোধহয় তোমার মা।

সেটা কেয়াও জানে। ফোন ধরতেই মা বললেন— হাত-মুখ ধুয়ে খেয়ে নাও। ঠাকুমাকে বলো, দেখিয়ে দেবেন।

কেয়া বাড়ির এসব কথা স্কুলে বলছিল। শুনে দিদিমণি বললেন — তোমাদের পরিবারে সবাই সবাইকে খুব ভালোবাসেন। তাই না?

কেয়া বলল— সবাই অন্য সকলকে সাহায্য করে।

— তুমি কীভাবে অন্যদের সাহায্য করো?

— কেউ খাবার জল চাইলে দিই। কিছু আনার দরকার হলে দোকানে যাই। কেউ বাইরে গেলে দরজার ছিটকিনি আটকে দিই। কেউ এলে দরজা খুলে দিই। বাগানের এক দিকের গাছে জল দিই। কারোর অসুখ হলে মাথায় জলপটিও দিয়ে দিই।

— বাঃ! বাড়ির সবার জন্য তুমি অনেক কিছু করো।

তারপর দিদিমণি বড়ো করে ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে দিলেন—

সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

তোমাদের বাড়িতে একজন অন্যজনকে কীভাবে সাহায্য করেন? নীচে লেখো :

পরিবারের মানুষ	তিনি কীভাবে অন্যদের সাহায্য করেন	তিনি কীভাবে অন্যদের কী সাহায্য নেন

না-মানুষের পরিবার

পিকু হঠাৎ শুনতে পেল কাকগুলো খুব ডাকছে। বাইরে বেরিয়ে দেখল একটা বিড়াল। গাছের গুঁড়িতে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তিনটে কাক একটা বিড়ালকে তাড়া করছে। তাকে গাছে উঠতে দেবে না। সে উঠতেও পারছে না। পিকু ভাবল, কাকগুলো এত রাগ করছে কেন?

এবার গাছের দিকে দেখল পিকু। একটা ডালে কাকের

বাসা রয়েছে। কয়েকটা ছানাও আছে। একটা কাক তাদের কাছে রয়েছে। অন্য কাকেরা বিড়ালটাকে তাড়া করছে। এতক্ষণে পিকু বুঝতে পারল। বিড়ালটা যাতে কাকের বাচ্চাদের নাগাল না পায়। তাই কাকেরা সবাই বিড়াল তাড়াতে ছুটে এসেছে। মা-কাক বাচ্চাদের আগলাচ্ছে। ও ভাবল, কাকগুলো কি সবাই মিলে একটা পরিবার? স্কুলে গিয়ে পিকু সব বলল।

ডমরু বলল— হ্যাঁরে, মানুষের মতো পাখিদেরও পরিবার আছে। চড়াইরাও ওইরকম।

দিদিমণি এসব শুনে হাসলেন। বললেন— কাকগুলো সবাই হয়তো এক পরিবারের নয়। তবে এক পাড়ার। তোমাদের পাড়ায় কারো বিপদ হলে তোমরা সবাই তার পাশে দাঁড়াও না?

— দাঁড়াই তো!

— এও সেই রকম। তবে পাখিদেরও পরিবার থাকে। দেখবে, সারাক্ষণ দুটো কাক ওই বাচ্চাগুলোকে আগলাবে। একটু বড়ো হলে ওদের খাওয়াবে। ওড়া শেখাবে। তবে বড়ো হয়ে গেলে পশু-পাখির বাচ্চাদের সঙ্গে বাঁধন

আলগা হয়ে যায়।

বৈশাখী বলল—কুকুর,বিড়ালরাও ছোটো বাচ্চাদের খুব আগলায়।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

তোমরা আরও অনেক না-মানুষ প্রাণী চেনো। পশু, পাখি, মৌমাছিদের মতো পতঙ্গ। এদের পরিবার বিষয়ে নিজেরাই অনেক জানো। নীচে সেইসব না-মানুষ প্রাণীর পরিবার নিয়ে লেখো:

না-মানুষ প্রাণীর নাম	তাদের পরিবার বিষয়ে কী দেখেছ	তাদের পরিবার বিষয়ে কী বুঝেছ

চিঠি পাওয়ার আনন্দ

কেতকী আর টিকাই স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছিল। পথেই পিয়নদাদা কেতকীকে একটা চিঠি দিলেন। উপরে ওরই নাম লেখা। তারপর বাবার নাম, গ্রাম, পোস্টঅফিস, জেলা। চিঠির বাঁ পাশে ছোটোপিসির নাম। তার নীচে অনেক কিছু লেখা।

কেতকী বলল— এ তো ছোটোপিসির নাম। তার তলায় কী লিখেছে?

পিয়নদাদা বললেন— ছোটোপিসির ঠিকানা।

কেতকী এবার বুঝল। ছোটোপিসি শিবনাথ বোসের বাড়িতে থাকে।

পরদিন কেতকী স্কুলে পোস্ট কার্ডটা নিয়ে গেল।

সুমনার কাকা কলকাতা থেকে এরকম চিঠি পাঠান। সুমনা বলল— এটা কেতকীর চিঠি। তাই ওর নাম ডান-পাশে। যিনি পাঠাচ্ছেন তাঁর নাম বাঁ-পাশে। এভাবেই চিঠিতে ঠিকানা লিখতে হয়। শহরে আবার বাড়ির নম্বর থাকে। আর যে রাস্তার পাশে বাড়ি, সেই রাস্তার নাম থাকে।

ডমরু বলল— পোস্টঅফিসের নাম লিখতে হয় না?

— পিনকোড আসলে পোস্টঅফিসের নম্বর। কলকাতার সব পোস্টঅফিসের নম্বর ৭০০ দিয়ে শুরু। তারপর আরো

তিনটে সংখ্যা থাকে।

— কেতকীর পিসি যেখানে থাকেন সেখানকার পোস্ট অফিসের নম্বর ০২৮?

— হ্যাঁ। আমার কাকার বাড়ির ঠিকানায় পিনকোড ৭০০ ০৬৪। তার মানে, সেখানকার পোস্ট অফিসের নম্বর ০৬৪।

এমন সময় দিদিমণি ক্লাসে এলেন। সব শুনে বললেন—
পোস্ট অফিস কথাটা ইংরাজি। বাংলায় বলে ডাকঘর। দেশের সব বড়ো ডাকঘরের পিনকোড নম্বর আছে। এখানকার পিনকোড ৭১২ ৪১৯। ওই একই পিনকোডে আবার কয়েকটা ছোটো ডাকঘর আছে। তাহলে তোমরা এবার থেকে চিঠিতে ঠিকানা লিখতে পারবে!

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

নিজের, বন্ধুদের আর নিকট আত্মীয়দের ঠিকানা নীচে লেখো :

তোমার নিজের ঠিকানা	বন্ধুদের ঠিকানা	নিকট আত্মীয়দের

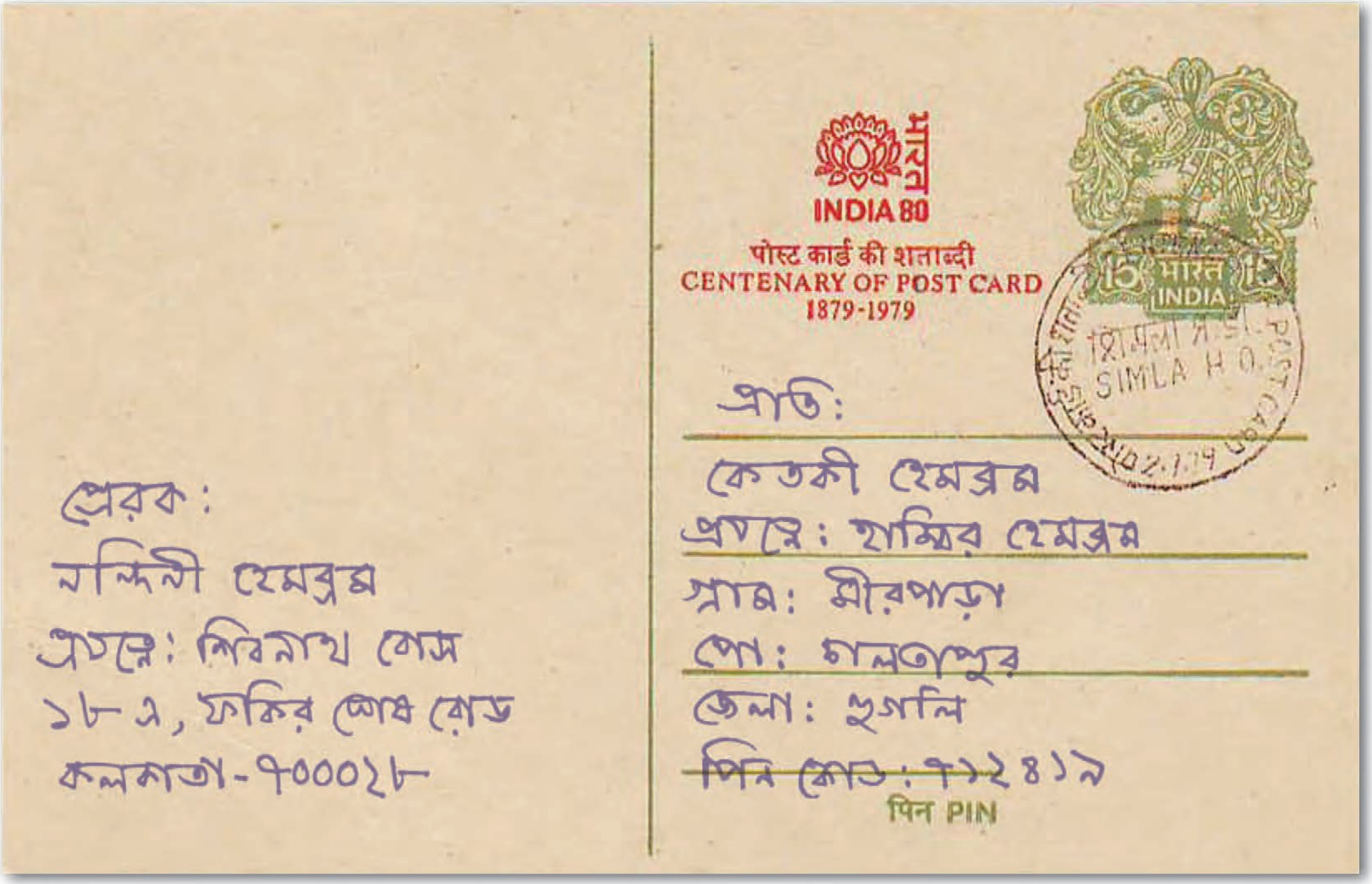
भारत
INDIA 80
पोस्ट कार्ड की शताब्दी
CENTENARY OF POST CARD
1879-1979
15 भारत INDIA 15
SIMLA H.O.
প্রাপক:
কেতকী হেমব্রম
প্রযত্নে: হাম্বির হেমব্রম
গ্রাম: মীরপাড়া
পো: গলতাপুর
জেলা: হুগলি
পিন কোড: ৭১২৪১৯
पिन PIN
প্রেরক:
নন্দিনী হেমব্রম
প্রযত্নে: শিবনাথ বোস
১৮-এ, ফকির ঘোষ রোড
কলকাতা-৭০০০২৮

ডাকঘরটা চিনতে শেখা

ঠিকানা লিখতে বসে নিতাই ভাবল, আমাদের গ্রামে তো ডাকঘর নেই! তামিমদের গ্রামের ডাকঘরেই সবাই যায়। কিন্তু ডাকঘরটা কোথায়? তামিমের কাছে জানতে চাইল। তামিম বলল— হাসানচাচার বাড়ির পাশ দিয়ে ঘুরে যাবি। তারপর সোজা দক্ষিণে।

নিতাই বুঝতে পারল না। তখন দিদিমণি বললেন— তামিম, ডাকঘর যাওয়ার পথের মানচিত্র আঁকতে পারবে?

তামিম বলল— কিন্তু দিদি, ডাকঘরের মানচিত্র কী করে আঁকব? অনেক দূর তো!

— সব কিছু দেখাবে না। দিকটা ঠিক রাখবে। রাস্তাগুলো দেখাবে। যেখানে দুই রাস্তা আছে, সেখানে কোন দিকে যাবে সেটা যেন বোঝা যায়। আর পাশে পুকুর, ধানখেত, মাঠ, বড়ো বাড়িগুলো দেখাবে।

— ওই গুলোর চিহ্ন ঠিক করে নেব?

— হ্যাঁ, এবার চেষ্টা করো।

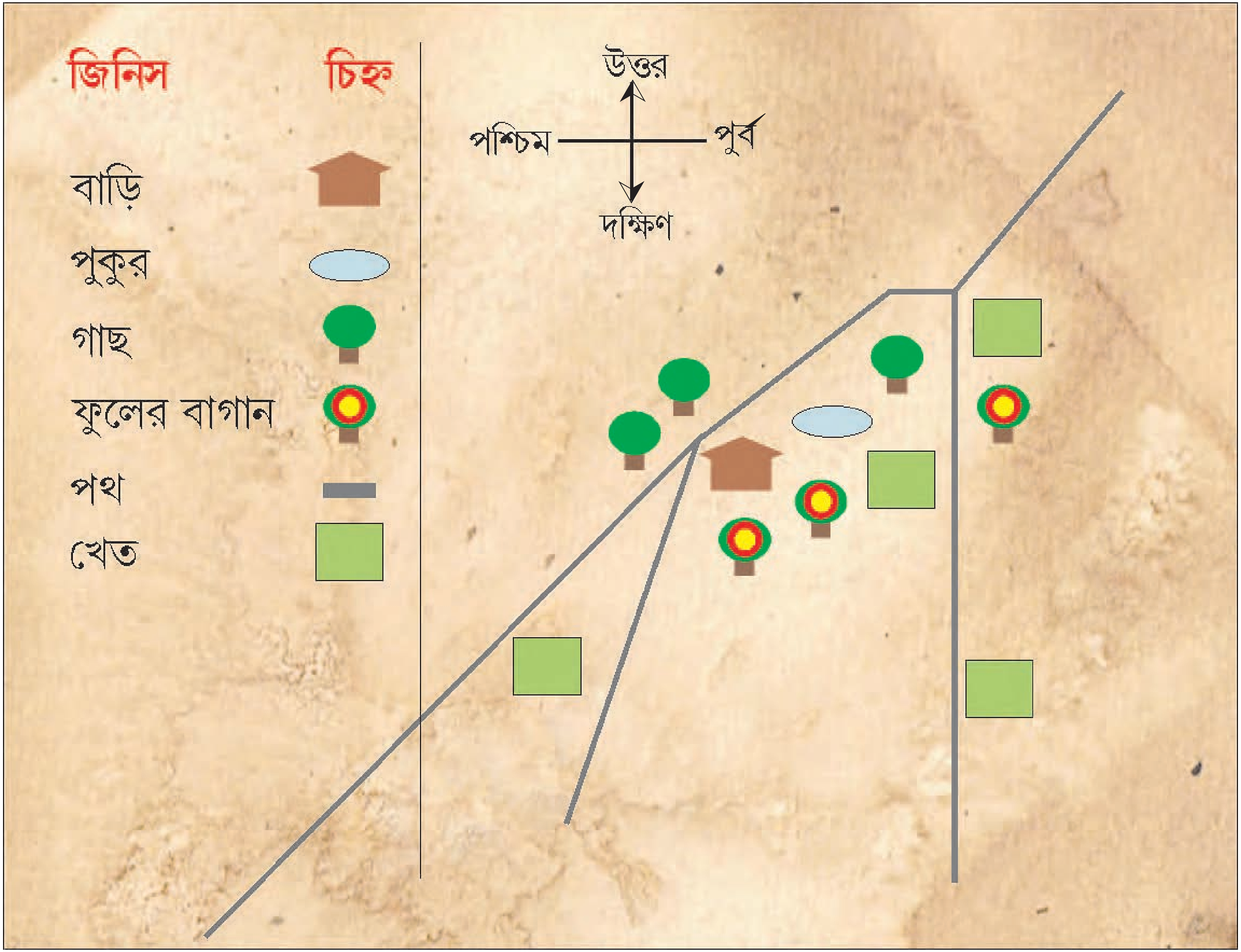
জিনিস
চিহ্ন
বাড়ি
পুকুর
গাছ
ফুলের বাগান
পথ
খেত
উত্তর
পশ্চিম
পুর্ব
দক্ষিণ

তামিম আর নিতাই চিহ্নগুলো ঠিক করে নিল। তারপর ডাকঘর যাওয়ার পথের মানচিত্র আঁকল। প্রথমে পূর্বদিকে। তিন রাস্তার মোড় থেকে উত্তর-পূর্বে। তারপর দুটো বড়ো বাড়ি। একটা পেরিয়ে সোজা দক্ষিণে পাকা রাস্তা। নিতাই বলল— আমি আজ বাড়ি ফেরার সময় ডাকঘরটা চিনে যাব।

তোমাদের ডাকঘরটা চেনো? ডাকঘরে একবার যাও। রাস্তাটা চিনে নাও :

কাকে চিঠি লিখতে চাও? পাশের ফাঁকা পোস্ট কার্ডটায় তাঁর ঠিকানা লেখো। ঠিক জায়গায় নিজের ঠিকানা লেখো :

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

১। তোমার বাড়ি থেকে স্কুলে আসার পথে যা যা আছে তার চিহ্ন ঠিক করে নাও। সেই পথের মানচিত্র আঁকো:

জিনিস	চিহ্ন	
পুকুর		

২। বাড়ি বা স্কুল থেকে ডাকঘরে যাওয়ার রাস্তার মানচিত্র আঁকো:

নতুন পথে চলা

ক্লাসে সবাই নিজের আঁকা মানচিত্র দেখাল। কে কেমন এঁকেছে তা দেখাদেখি হলো।

দিদিমণি বললেন— ঠিকানা লেখা হলো। মানচিত্র আঁকা হলো। কিন্তু আসল কথাটা তো নতুন জায়গা চিনে যাওয়া!

আমিনা বলল— দিদি, কালই আমি একা একটা নতুন জায়গায় যাব।

— লোকজনকে জিজ্ঞাসা করে করে যাবে। প্রথমে জানবে গ্রামটা কোথায়। গ্রামে পৌঁছে যাদের বাড়ি যেতে চাও তাদের নাম বলবে। জানবে বাড়িটা কোথায়। এভাবে চেনা হয়ে যাবে।

বাড়িতে গিয়ে আমিনা দিদিমণির কথা বলল। মা তো শুনে অবাক। বললেন— দূরের অচেনা গ্রামে একা যাবে কেন? তোমার কি কেউ নেই নাকি?

অনেক কথার পর যাওয়া ঠিক হলো। নিজেদেরই আগের বাড়ি ঝিঙেপোতায়। সেখানেই যাওয়া হবে। মা সঙ্গে যাবেন। তবে রাস্তা চেনাবেন না। বাস থেকে নেমে যাকে যা জিজ্ঞেস করার আমিনাই করবে।

ঠিকানাটা আগেই লিখে নিয়েছিল আমিনা। বড়োচাচারা সেখানেই থাকেন। বাস থেকে নেমে তিনটে গ্রাম পেরিয়ে যেতে হয়। আমিনা সাতজনকে জিজ্ঞেস করেই পৌঁছে গেল। মেয়ের কাণ্ড দেখে মা একেবারে অবাক!

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

ঠিকানা জেনে একটা অচেনা বাড়িতে যাও। ফিরে গিয়ে পথের মানচিত্র আঁকো :

জিনিস	চিহ্ন	তোমার ঠিকানা	যেখানে গেলে, সেখানকার ঠিকানা

বাড়ি বদলে যায়

পরদিন বাসস্টপ থেকে সেই বাড়ি পর্যন্ত মানচিত্র এঁকে নিয়ে এল আমিনা। স্কুলে সবাইকে দেখাল। রবীন বলল— তোদেরই বাড়ি। অথচ তুই আগে যাসনি?

ডমরু বলল— ওখান থেকে তোরা এখানে চলে এলি কেন?

কারণটা আমিনা জানত। বলল— ওখানে খুব বন্যা হয়।

এবার মৌমিতা বলল— অনেকদিন আগে আমাদেরও বাড়ি ছিল ঝিঙেপোতায়। ঠাকুমার কাছে শুনেছি।

রবীন বলল— তোরাও কি বন্যার জন্য চলে এসেছিলি?

— তা ঠিক জানি না। আমার ঠাকুরদা এখানকার স্কুলে পড়াতেন। তাই এখানে এসে বাড়ি করেছিলেন।

দিদিমণি এসে এসব শুনলেন। তারপর বললেন— অনেক পরিবারই এই রকম ঠিকানা বদলায়। নানাকারণে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যায়। আমিই তো এই গ্রামে চাকরি করতে এসেছি।

সুমনা বলল— আমার কাকা চাকরি করতে কলকাতায় গেছেন।

— তোমাদের চেনা আরো অনেকে অন্য জায়গা থেকে এসেছেন। কেউ বা অন্য কোথাও চলে গেছেন। এসব নিয়ে তোমরা কী জানো ভাবো তো।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

তোমাদের চেনাজানা কারা ঠিকানা বদল করেছেন? সে বিষয়ে নীচে লেখো:

কার কথা বলছ	কোথা থেকে এসেছেন বা কোথায় চলে গেছেন	কেন এসেছেন বা কেন চলে গেছেন

জীবিকার আদিকথা

কেতকীরা আগে পাশের রাজ্যে থাকত। অনেকদিন আগে ওর ঠাকুরদার বাবা কাজের জন্যই এখানে এসেছিলেন। অন্যের জমিতে চাষের কাজ। এখানে বেশি কাজ পাওয়া যেত। আয় বেশি হতো। কেতকীর ঠাকুরদারও জীবিকা ছিল অন্যের জমিতে চাষ করা। কিন্তু কেতকীর বাবা পঞ্চায়েতে চাকরি করেন। এভাবে ওদের জীবিকা বদলে গেছে।

স্কুলে একথা বলায় শান্তনু বলল— আমাদেরও তাই। ঠাকুরদা স্কুলে পড়াতেন। কিন্তু বাবা বাড়ি তৈরির জিনিসের দোকান করেছেন। কাকাও সেই দোকান দেখেন। এখন আমাদের জীবিকা হলো ব্যবসা।

আলি বলল— আমার দাদা গামছা বুনতেন। আব্বা টেলারিং-এর দোকান করলেন। বদলে গেল জীবিকা।

চিনু বলল— আমার ঠাকুরদা চুল কাটতেন। বাবা এখন

বাসের ড্রাইভার। বড়োজেঠু অবশ্য সেলুন খুলেছেন। এখনও চুল কাটেন।

আকাশ বলল— আমার ঠাকুরদা মাছ ধরতেন। বাজারে বেচতেন। বাবাও মাছ ধরে, বাজারে বেচেন।

দিদিমণি ক্লাসে এসে ওদের আলোচনা শুনলেন। তারপর আকাশকে বললেন— তোমাদের পারিবারিক জীবিকা এখনও বদলায়নি। তুমি বড়ো হলে হয়তো বদলাবে!

একথা শুনে কেতকী বলল— দিদি, পারিবারিক জীবিকা মানে কী?

— বহু কাল ধরে কিছু পরিবারের লোকরা একই ধরনের কাজ করেছেন। যেমন কর্মকার, কুম্ভকার, কৃষক —আরও অনেক কিছু। এইগুলো পারিবারিক জীবিকা।

অ্যালিস বলল— এখন আর সেভাবে পারিবারিক জীবিকা নেই! একই পরিবারের লোকরা আলাদা আলাদা কাজ করেন।

— ঠিক তাই।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

নিজের আর বন্ধুদের পারিবারিক জীবিকা, এখনকার জীবিকা এসব নিয়ে যা জানো নীচে লেখো :

নাম	পারিবারিক জীবিকা	এখনকার জীবিকা

জীবিকার বাকি ইতিহাস

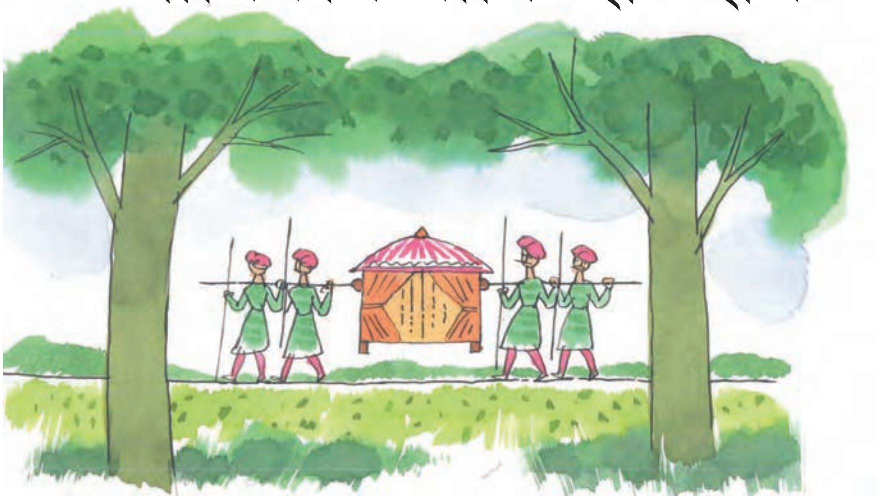

হেনা ভাবল, আগে তো বাস ছিল না। তাহলে আর লোক ড্রাইভার হবে কী করে? সেকথা বাড়িতে বলতেই ঠাকুমা বললেন--- আগে তেমনি লোকে পালকি চেপে

যেত। পালকির বেহারা হওয়া একটা জীবিকা ছিল। ঠাকুরদা বললেন— ঘোড়ার গাড়ি ছিল। সেই গাড়ি চালাত কোচোয়ান। সেটাও ছিল একটা জীবিকা ।

একটু পরে হেনার দাদা বেরিয়ে গেলেন। উনি ক্যাটারারের কাজ করেন। বিয়ে বাড়িতেপরিবেশন করবেন। ওর বাবা গেলেন দোকান খুলতে। উনি দোকানে ফোটোকপি করেন। পরদিন দিদিমণিকে হেনা এসব কথা বলল। উনি বললেন— হ্যাঁ। কিছু জীবিকা এখন আর নেই। সেগুলো লুপ্ত জীবিকা। কিছু জীবিকা আগে ছিল না, এখন হয়েছে। সেগুলো নতুন জীবিকা।

নিতাই বলল— দিদি, কম্পিউটারের দোকান করা একটা নতুন জীবিকা।

বৈশাখী বলল— আগে অনেকে শাঁখা ফেরি করতেন। ফেরিওলারা ঘুরতেন আর বলতেন শাঁখা চাই। বড়োঠাকুমার কাছে শুনেছি।

— হ্যাঁ। শাঁখা ফেরি করা এই অঞ্চলে লুপ্ত জীবিকা। তবে অন্য কোথাও ওইরকম ফেরিওলা থাকতেও পারেন।

ডমরু বলল— অনেক আগে তো লোকে বল্লম দিয়ে শিকার করত?

— হ্যাঁ। শিকার খুব প্রাচীন এক জীবিকা। এখন অবশ্য বন্যপ্রাণী সংখ্যায় খুব কমে গেছে। তাই শিকার করা নিষিদ্ধ। কুমোরের কাজ, কামারের কাজ এসবও প্রাচীন জীবিকা।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

প্রাচীন জীবিকা, লুপ্ত জীবিকা, নতুন জীবিকা নিয়ে আরও আলোচনা করো। তারপর নীচে লেখো:

প্রাচীন জীবিকার নাম ও কাজ	লুপ্ত জীবিকার নাম ও কাজ	নতুন জীবিকার নাম ও কাজ

নীল আকাশের রহস্য

গাছের ডালে মৌচাক দেখছিল মন্দিরা আর ইমরান। মৌমাছিদের যাওয়া আসার শেষ নেই। উড়তে উড়তে একজন আকাশে হারিয়ে গেল। একজন আবার এসে ঢুকল মৌচাকে। মন্দিরা বলল— ওদের মতো তোর নীল আকাশে হারিয়ে যেতে ইচ্ছে করে না?

ইমরানও তাই ভাবছিল। বলল— করে তো!

— ইচ্ছে হয়, উড়তে উড়তে সাদা মেঘের পিছনে চলে যাই!

— আচ্ছা, সাদা মেঘের পিছনে আকাশের কী রং বল তো?

— নীলই হবে। এমনিতে আকাশ তো নীলই। কাকা বলেছিলেন, মেঘে জলের কণা থাকে। খুব অল্প ছোটো ছোটো জলকণা থাকলে মেঘ সাদা।

পরদিন স্কুলে এসে দিদিমণিকে ইমরান এসব কথা বলল। সবাই শুনল। দিদিমণি বললেন— অনেক ছোটো ছোটো জলকণা থাকলে মেঘ কালো। আর জলকণা বড়ো বড়ো হয়ে গেলে মেঘ ছাই ছাই দেখায়।

আলি বলল— কিন্তু এমনিতে কি আকাশ নীল? রাতে কি নীল দেখায়?

সুমি বলল— ঠিক! রাতে তো কালো আকাশে তারা ঝিকমিক করে।

— কিন্তু চাঁদের কাছাকাছি জায়গাটায় মাঝে মাঝে আলো দেখা যায়।

হারান বলল— দিদি, দিনের বেলাও সূর্যের কাছের আকাশটা

ঠিক নীল নয়। সূর্য থেকে দূরের আকাশটা নীল হয়।

দিদি বললেন --- ঠিক বলেছ। কিন্তু তুমি সূর্যের দিকে তাকিয়েছিলে নাকি? সোজাসুজি সূর্যের দিকে তাকালে চোখের ক্ষতি হবে।

সবুজ বলল— কী করে বুঝব কোন দিকে সূর্য?

রাবেয়া বলল— নিজের ছায়াটা দেখতে হবে। ছায়ার ঠিক উলটো দিকে সূর্য থাকে।

— ঠিক বলেছ। এবার বলো দেখি বিকেলে সূর্য কোন দিকে থাকে?

— পশ্চিম দিকে। তখন আমার ছায়া থাকবে পূর্ব দিকে।

— ঠিক। তখন ছায়ার দিকে মুখ করে দাঁড়ালে সামনে পূর্বদিক, পিছনে পশ্চিম, ডানদিকটা দক্ষিণ, বাঁদিকটা

উত্তর। বাড়িতে গিয়ে ভালো করে দেখে বুঝে নেবে। ছুটির দিনে কয়েক ঘণ্টা অন্তর নিজের ছায়াটা দেখবে। তার সঙ্গে খেয়াল করবে কখন কোন দিকে সূর্য ছিল।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন ঋতুতে, বিভিন্ন জায়গায় আকাশের কী রং দেখেছ, তা নীচে লেখো :

কোন ঋতুতে দেখেছ	কোন সময় দেখেছ	আকাশের কোন জায়গা	কেমন রং
গ্রীষ্ম	সকাল	পশ্চিম দিক	

সূর্য থেকে আলো, সূর্য থেকে তাপ

এ কেমন কথা? নানা সময়ে আকাশের রং নানারকম! সন্দীপ বলল— দিদি, আকাশের রং কি বদলে যায়? দিদিমণি বললেন— আসলে আকাশের কোনো রং নেই। বাতাস রয়েছে। বাতাসে ছোটো ছোটো ধুলোর কণা ভাসে। দিনের বেলা এসবের উপর সূর্যের আলো পড়ে। তাই রং দেখা যায়। রাতের আকাশে সূর্য থাকে না।

তাই আকাশ কালো।

রবীন বলল— চাঁদ থাকলে একটু আলো হয়। তাই কিছুটা দেখা যায়। তাই না?

কেতকী বলল— চাঁদের আলো কম। বেশি দূর দেখা যায় না। দিনের বেলা অনেক দূরের জিনিস দেখা যায়।

— বেশ। অমাবস্যার রাতে আকাশে চাঁদ থাকে না। তখন কত দূর দেখা যায়?

— সামনে কেউ দাঁড়িয়ে থাকলেও চেনা যায় না।

— আর আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ থাকলে?

কেতকী বলল— আট-দশ মিটার দূরের চেনা লোককে চেনা যায়।

হারান বলল— আট-দশ মিটার মানে?

— তিনতলা বাড়ির নীচ থেকে ছাদটা আট-দশ মিটার হয়। পূর্ণিমার রাতে নীচ থেকে ছাদের লোক চেনা যায়।

রফি বলল— ওঃ! একটা বড়ো নারকেল গাছ যেমন উঁচু হয়।

দিদিমণি বললেন — আচ্ছা, দিনের সবসময় কী একই

রকম আলো হয়?

— না, বিকেলে আলো কমে যায়। গরমও কমে যায়।

— সূর্যের আলো কমলেই কি গরমও কমে?

— অনেক সময় মেঘ করলে আলো কমে, কিন্তু গরম কমে না।

— বেশ বলেছ তো!

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

আলো আর গরম কোন সময়ে বাড়ে আর কমে তা ভালো করে দেখে ও অনুভব করে নীচে লেখো :

সময়	ঘটনা	দিনের আলো বাড়া-কমা	গরম বাড়া-কমা
সকাল	পূর্ব আকাশে সূর্য		

দিনভর ছায়ার খেলা

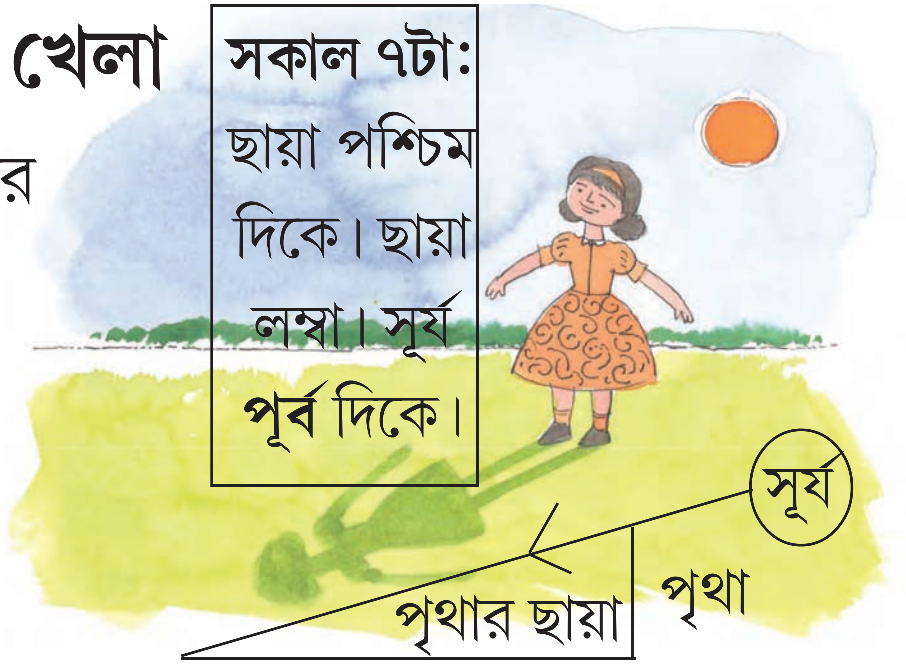

কখন কোথায় নিজের ছায়া পড়ছে তা মন দিয়ে দেখল পৃথা। ছায়াটা ওর চেয়ে লম্বা না খাটো তাও দেখে লিখল। আর ছায়ার উলটো দিকে সূর্য। এটা বুঝে সূর্য কোথায় ছিল তাও লিখল। ছবিও আঁকল।

স্কুলে সবাইকে সেটা দেখাল। দিদিমণি বললেন— এই ছবির বদলে একটা সহজ ছবি এঁকে ছায়াটা বোঝানো যায়।

এই বলে দিদি একটা ছবি এঁকে দেখালেন। বললেন — এটা পৃথার ছায়ার রেখাচিত্র।

একটা রেখা পৃথা, একটা রেখা সূর্য থেকে পৃথার মাথা ছুঁয়ে গেছে। আর একটা রেখা পৃথার ছায়া।

সবাই খুব ভালো করে দেখল। হামিদ বলল— আমিও আঁকতে পারব।

দিদি পৃথাকে বললেন— সা পরে আর ছায়া দেখোনি?

পৃথা বলল— তারপর দশটায় দেখেছি। স্কুলে আসার আগে। তখন সূর্য পূর্বে, কিন্তু প্রায় মাথার উপরে।

এই বলে দশটার সময় নিজের ছায়া, সূর্য আর নিজের ছবিটা দেখাল পৃথা।

ছবি দেখেই হামিদ দশটার সময় পৃথার ছায়ার রেখাচিত্রটা আঁকল।

দিদি বললেন— এই তো শিখে গেছ। ছুটির দিনে সবাই দেখবে। সারদিনে ছ-বার। দেখবে, রেখাচিত্র আঁকবে।

সকাল ১০টা :
ছায়া পশ্চিম দিকে।
ছায়া খাটো।
সূর্য **পূর্ব** দিকে,
প্রায় মাথার উপরে।

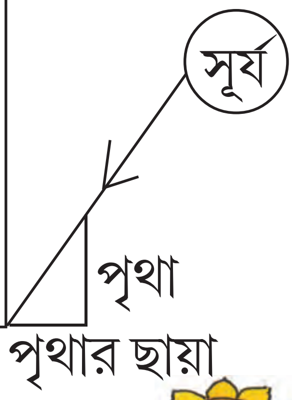

সারাদিনে ছয়বার নিজের ছায়া দেখো। তোমার নিজের, সূর্যের আর তোমার ছায়ার রেখাচিত্র আঁকো। কোন সময়ের ছবি তাও পাশে লেখো। নিজেদের খাতায়ও এঁকে এবং লিখে রাখতে পারো :

চাঁদমামার লুকোচুরি

ভালো করে সূর্য দেখার পর পৃথা ভাবল, চাঁদ কোথায় ওঠে? কোথায় ডোবে? সন্ধ্যাবেলা আকাশে চাঁদ খুঁজল। কোথাও নেই। মাকে বলল— মা আকাশে তো মেঘ নেই। তবু চাঁদ দেখা যাচ্ছে না কেন?

মা বললেন--- কাল অমাবস্যা গেল! আজ থেকে শুক্লপক্ষ শুরু। আজ প্রথম সন্ধ্যা। আমরা বলি শুক্লপক্ষের

প্রথমা তিথি। আজ চাঁদ দেখা যাবে না। কাল সন্ধ্যাবেলা দেখতে পাবে।

পরের সন্ধ্যায় পৃথা আবার দেখল। সত্যিই তো, বাঁকা কাস্তের মতো সরু একটা ফালি চাঁদ উঠেছে। পশ্চিম আকাশে! মাকে বলল— মা, চাঁদ পশ্চিম আকাশে ওঠে? সূর্যের মতো পূর্ব আকাশে ওঠে না?

মা হাসল। বললেন— রোজ সন্ধেবেলা দেখো। তারপর বুঝবে। আজ শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া। এরপর তৃতীয়া, চতুর্থী। এভাবে চলবে।

আধ ঘণ্টা পরে আবার চাঁদ দেখতে গিয়ে পৃথা অবাক। চাঁদটা কোথাও নেই।

পরের তিনদিন পৃথা ভালো করে লক্ষ করল। পরপর চাঁদটা বড়ো হচ্ছে। আর মাঝ আকাশের দিকে সরে সরে উঠছে।

তিনদিন পর। ষষ্ঠীর সন্ধ্যা। পৃথা খুব ভালো করে দেখল চাঁদটা। কমলালেবুর কোয়ার মতো দেখাচ্ছে। মাকে

দেখাল। মা বললেন — পূর্ণিমার দিকে যত যাবে, চাঁদটা তত বড়ো হবে।

পরদিন স্কুলে এসব কথা বলল পৃথা।

স্বপন বলল— আমিও দেখেছি দিদি। পূর্ণিমার সন্ধ্যায় চাঁদটা ঠিক পূর্ব আকাশে ওঠে। গোল থালার মতো!

আয়ুব বলল— পূর্ণিমার আকাশে শুধুই চাঁদ। তারা বেশি দেখা যায় না।

দিদিমণি বললেন— ঠিক বলেছ। পূর্ণিমার পর থেকে কৃষ্ণপক্ষ শুরু হয়। প্রথম সন্ধ্যাকে বলে কৃষ্ণপক্ষের প্রথমা। তারপরের সন্ধ্যায় কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া, তারপর তৃতীয়া। এভাবে চলতে থাকে। কোন তিথিতে আকাশে অনেক তারা দেখা যায় বলতে পারো?

সবাই ভাবতে থাকল। পৃথা বলল— এবার ভালো করে দেখব।

— বেশ। আগামী এক মাস ধরে রোজ দেখবে। কবে, কোনদিকে চাঁদ উঠছে। কত বড়ো। কোনদিকে সরছে। কোথায় অস্ত যাচ্ছে। আকাশে তারা কম নাকি বেশি!

চাঁদ আর তারা দেখো। যা দেখছ সেসব কয়েকদিন অন্তর লেখো। রোজ লিখতে চাইলে খাতায় লেখো :

অমাবস্যার কতদিন পরের কথা	চাঁদের ছবি	আকাশের কোনদিকে ও কখন চাঁদ উঠেছে	চাঁদ কোনদিকে সরছে ও কোথায় অস্ত যাচ্ছে	আকাশে আগের রাতের চেয়ে তারা কম নাকি বেশি
তিনদিন		পশ্চিম দিকে, সন্ধ্যাবেলা	পশ্চিম দিকে, পশ্চিম দিকে	
পূর্ণিমার কতদিন পরের কথা				

তারায় তারায় আলোর নদী

রাতের আকাশে কত তারা! ফুটকি ফুটকি আলো, বড়ো-ছোটো! মাঝ আকাশে আলোর একটা নদী! প্রায় উত্তর-দক্ষিণে। ওতেও কি অনেক তারা? তারাগুলো কি এক জায়গায় থাকে? নাকি, সূর্যের মতো সরে সরে যায়!

স্টিফেন পূর্ব আকাশে তিনটে তারা দেখে রাখল। ভাবল, পরে আবার দেখব, তারাগুলো সরে যায় কিনা। দু-ঘণ্টা পরে এসে দেখল পশ্চিমে সরে গেছে।

স্কুলে গিয়ে এসব কথা বলল। আলি বলল— আমিও দেখেছি। তারাগুলো সরে যায়।

বিশাখা বলল— তাই? আমি তো দেখেছি সারা রাতই আকাশ একই রকম তারা ভরতি থাকে।

দিদিমণি বললেন— তাহলে ভালো করে কয়েকটা তারা দেখবে। সরছে কিনা। তারপর এনিয়ে আবার কথা হবে।

স্টিফেন বলল— দিদি, তারাগুলোর কোনোটা ছোটো, কোনোটা বড়ো কেন?

আলি বলল— ছোটো আলো ছোটো দেখাবে। বড়ো আলো বড়ো দেখাবে। এ তো জানা কথা!

জেমস বলল— তা কেন? দূরে থাকলে বড়ো আলোও ছোটো দেখায়।

দিদি বললেন— তাই? কোথায় এমন দেখেছ?

— রাস্তার আলো। ঘরের আলোর চেয়ে বড়ো। কিন্তু দূর থেকে দেখলে মনে হয় একটা টুনি বাল্‌ব!

অপূর্ব বলল— দেখতে ছোটো তারাগুলো সত্যিই ছোটো হতে পারে। আবার দূরের বড়ো তারাও হতে পারে।

—রাতের আকাশের দিকে কখনও তাকিয়ে দেখেছ কি? কখনও কখনও আকাশের একদিক থেকে অন্যদিক অবধি একটা আবছা আলোর আভা ছড়িয়ে আছে দেখতে পাবে। এই আবছা আলোর আভাটাই হলো ছায়াপথ। ছায়াপথে ছোটো-বড়ো অনেক তারা থাকে।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

তারা আর ছায়াপথ বিষয়ে আর কী কী দেখেছ? নীচে লেখো :

কোন তিথিতে ছায়াপথ দেখেছ	
সন্ধ্যা থেকে রাতে কোনদিকে তারা সরতে দেখেছ	
ছায়াপথের একটা ছবি আঁকো	

তারার কথা, মেঘের কথা

সবাই ভালো করে দেখে একমত হলো। তারাগুলো পূর্ব থেকে পশ্চিমে সরে যায়। নন্দিনী প্রথমে উত্তর আকাশের তিনটে তারা দেখেছিল। সেগুলো সরেছে কিনা বুঝতে পারেনি। পরে উত্তর-পূর্ব কোণের তিনটে তারা দেখে রেখেছিল। আরও দু-ঘণ্টা পরে দেখেছে, সেগুলোও পশ্চিম দিকে সরেছে।

দিদিমণি বললেন--- কেউ দক্ষিণ আকাশের তারা দেখোনি?

রেহানা বলল— দেখেছি। সেই তারাগুলোও সরে গেছে।

--- বেশ। আজ সন্ধ্যাবেলা পূর্ব, উত্তর আর দক্ষিণ আকাশের তারা দেখবে। কোনটা বেশি সরছে, কোনটা কম সরছে।

— আজ আকাশে মেঘ রয়েছে। রাতে কী আর দেখা যাবে?

— বেশ তো। যে সন্ধ্যায় মেঘ থাকবে না, সেই সন্ধ্যায় দেখবে।

অবন্তি বলল— দিদি, মেঘ কেন হয়?

সুজন বলল--- পুকুরের জল বাষ্প হয়ে যায়। সেই বাষ্পই মেঘ।

— অনেকটা ঠিক বলেছ। তবে জলের বাষ্প দেখা যায় না।

সুজন অবাক। বলল— জল ফোটালে ধোঁয়ার মতো বাষ্প ওড়ে তো?

—সেগুলোও জলকণা।

অবন্তি বলল— শীতকালে পুকুরের উপরে যে ধোঁয়া দেখা যায়?

— ওগুলোও জলকণা। জলের বাষ্প সামনের বাতাসেও রয়েছে। কিন্তু দেখা যায় না। ফুটন্ত জল থেকে একটু উঠেই বাষ্প ঠান্ডা হয়ে যায়। বাতাসে ভেসে থাকা খুব ছোটো ধুলোর কণার গায়ে ছোটো ছোটো জলকণা জমে। সেইগুলো ধোঁয়ার মতো দেখা যায়।

রেহানা বলল— আর মেঘ?

— নদী, সাগরের জল শুকিয়ে বাতাসের জলীয় বাষ্প বাড়ে। বাতাসে ভেসে থাকা ধুলোর কণার গায়ে ওই বাষ্প ঠান্ডা হয়ে জলকণা হিসাবে জমে। পাশাপাশি ভাসে। তারা সূর্যের আলো আটকে দেয় বা নানাদিকে ছড়িয়ে দেয়। আকাশের সেই জায়গাটাকেই বলে মেঘ।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

রাস্তায় ধুলো ওড়ে। ঘরের মধ্যের ধুলো দেখেছ? রাতে টর্চের আলো দিয়ে দেখা যায়। দিনে দরজার ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো পড়লেও ধুলো দেখা যায়। নানাভাবে দেখো। কোথায় কীভাবে দেখেছ তা লেখো আর আঁকো :

কখন ঘরের ধুলো দেখেছ	কীভাবে দেখেছ, ছবি এঁকে দেখাও	কোন সময় বেশি ধুলো দেখেছ

মেঘ-বৃষ্টি-বাজ

মেঘ নিয়ে
কথা হতে
হতেই সত্যিই
বৃষ্টি এল।
বিদ্যুতের চমক
আর কড় কড়
শব্দে বাজ পড়া
শুরু হলো।
ক্লাসে সবাই
নড়েচড়ে বসল।
ঋতু বলল— দিদি
বাজ পড়ে কেন?
নবীন বলল---
মেঘে মেঘে ঘষা

লাগে। আগুন বেরোয়।

সুজন বলল— সে কী করে হবে? মেঘ কী পাথর নাকি? মেঘ তো আসলে জলের ছোটো ছোটো কণা! তাতে কী করে ঘষা লাগবে?

সাবিনা বলল— একটা কাক উড়ে ইলেকট্রিক লাইনের দুটো তারের মাঝে গিয়েছিল। জোর শব্দ হলো। আর কী আলো! কাকটা মরে গেল। সেদিন আমার খুব মনখারাপ হয়েছিল।

— বাজ পড়া আসলে ওইরকম। মেঘের একটা জায়গা থেকে আর একটা জায়গায় বিদ্যুৎ যায়। তাতে আলোর ঝলক দেখা যায়। তখন আকাশে বিদ্যুৎ চমকায়। মেঘ থেকে মাটিতে বিদ্যুৎ গেলে আমরা বলি বাজ পড়ল।

কৃষ্ণা বলল— দিদি, নারকেল আর তালগাছের ওপরেই কেন বাজ পড়ে?

— ওগুলো উঁচু গাছ। ওদের মাথাগুলো মাটি থেকে অনেকটা উঁচুতে। তার মানে, অন্যান্য গাছের তুলনায় মেঘের একটু কাছে থাকে।

সুজন বলল - মেঘের কাছে বলেই উঁচু গাছের মাথায় বাজ পড়ে!

তিন্নি বলল— একবার বাজ পড়ে আমাদের একটা নারকেল গাছ মরে গেছিল। তার গুঁড়ি দিয়ে আমাদের পুকুরঘাট বাঁধানো হয়েছে।

— অনেকেই তাই করেন। এমনিতে এসব গাছ কেউ কাটে না। বাজ পড়ে গাছ মরে গেলে কিছু করার থাকে না। তখন গাছটা ফেলে না দিয়ে নানাভাবে কাজে লাগানো হয়।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

তোমাদের বাড়ির বা স্কুলের কাছাকাছি কোথাও বাজ পড়লে সে বিষয়ে জেনে নিয়ে নীচে লেখো :

কোথায় বাজ পড়েছে	কখন (বৃষ্টির আগে, না বৃষ্টির সময়, নাকি পরে)	তাতে কাদের কী ক্ষতি হয়েছে

আকাশে রং-এর ছটা

বৃষ্টি থামার পর ছুটি হলো। বাড়ির পথে চলল সবাই। আবার একটু রোদ উঠল। হঠাৎ করিম দেখল, আকাশে যেন অনেকগুলো রং সাজানো রয়েছে। বলল— ওই দেখ, আকাশ কত রং সাজিয়ে রেখেছে। সবাই দেখল।

রেখা বলল— কী কী রং আছে বল দেখি?

সবাই মিলে গুনতে শুরু করল। গোনার পর রংয়ের সংখ্যা নিয়ে নানাজনের নানা মত।

— চারটে রং। নীল, সবুজ, হলুদ আর লাল।

— নীলের আগে একটু বেগুনি আভা দেখছিস না? পাঁচটা রং।

পরদিন সবাই মিলে ক্লাসে আকাশে রংয়ের ছটার কথা বলল।

দিদিমণি বললেন— চার-পাঁচটা রং মনে হয়েছে? দূর থেকে ভালোই দেখেছ! তবে ওই নীলের দুটো ভাগ আছে। একটু গাঢ়, আর একটু হালকা। এমনিতে আকাশ ওইরকম হালকা নীল দেখায়। তাই ওই রংটাকে বলে আকাশি।

রিম্পা বলল— তাহলে মোট ছ-টা রং?

— খুব ভালো করে দেখলে হলুদ আর লালের মাঝে একটা

কমলা রং দেখা যায়। তাই আমরা বলি মোট সাতটা রং।

— বেগুনি, নীল, আকাশি, সবুজ, হলুদ, কমলা আর লাল?

— ঠিক! রংগুলোর নামের প্রথম বর্ণগুলো পরপর লেখো তো।

সবাই খাতায় লিখল— **বে নী আ স হ ক লা।**

তনিমা বলল— আচ্ছা দিদি, খানিক পরেই রংগুলো মিলিয়ে গেল কেন?

— ওগুলো আসলে ছোটো ছোটো জলের ফোঁটার জন্য তৈরি হয়। জলের ফোঁটাগুলো যেই বাষ্প হয়ে যায় তখনই রংগুলো মিলিয়ে যায়।

লাল	
কমলা	
হলুদ	
সবুজ	
আকাশি	
নীল	
বেগুনি	

করিম অবাক হয়ে বলল— জলের ফোঁটা?

— হ্যাঁ। ছোটো ছোটো জলের ফোঁটার উপর সূর্যের আলো পড়ে। এক একটা ফোঁটা থেকে এক এক রংয়ের আলো চোখে আসে। যে ফোঁটা থেকে যে রংয়ের আলো আসে সেটা সেই রংয়ের দেখায়।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

আকাশে রংয়ের ছটা দেখেছ? কেমন দেখতে, আঁকো। তুমি কোথায় ছিলে, সূর্য কোথায় ছিল তাও আঁকো:

মিশল আকাশ মাটির পরে

ছুটির দিন। পিনাকী মামার বাড়ি যাচ্ছিল। মামার সঙ্গে। হেঁটে গেলে কম পথ। বড়ো মাঠটা পেরোলেই পৌঁছে যাবে। দু-জনে ঠিক করল হেঁটেই যাবে। মাঠটার কাছে

এসে পিনাকী দূরে তাকাল। মাঠের ওপারে আকাশটা কি গাছের মাথায় মিশে গেছে! মামাকে জিজ্ঞেস করল। মামা হেসে বললেন— চলো, ওখানে গেলেই দেখা যাবে।

হাঁটতে হাঁটতে ওরা মামার বাড়ির গাঁয়ে পৌঁছে গেল। মামা বললেন— দেখো তো, আকাশটা কোথায়?

পিনাকী দেখল আকাশটা আগের মতোই অনেক উঁচুতে। বুঝতে না পেরে মামার দিকে তাকাল।

মামা বললেন— চলো, আমাদের বাড়ির পাশেই তো মাঠ। সেখানে গিয়ে আবার দেখবে আকাশটা কোথায়!

মামার বাড়ির কাছে পৌঁছে পিনাকী একাই মাঠের ধারে গেল। মাঠের ওপারের আকাশ এখানেও মিশেছে মাটিতে!

পরদিন স্কুলে এইসব কথা বলল পিনাকী।

তনিমা বলল— আমিও দেখেছি। পিসির বাড়িতে যাওয়ার সময় দেখেছি।

দিদিমণি বললেন— ফাঁকা জায়গায় গেলেই এমন দেখা যাবে।

— দিদি, দূরের ওই জায়গাটাকে কী বলে?

— দিগন্তরেখা। দিকচক্ররেখা। এইসব নাম আছে।

মৌলি বলল— দিদি, দিগন্তরেখা কত দূরে হয়?

— ফাঁকা জায়গাটা যত বড়ো হবে দিগন্তরেখা তত দূরে চলে যাবে। আকাশটা মাটির বেশি কাছে মিশেছে মনে হবে।

আয়ুব বলল— আমাদের বাড়ির পিছনে সারি সারি গাছ। পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে তাকালে মনে হয় যেন গাছগুলো অনেক দূরে গিয়ে আকাশে মিশে গেছে।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

নীচে একটা মাঠ আর মাঠের পারে দিগন্তরেখা আঁকো:

পাহাড়ে চড়ার মজা

দিদিমিণির সঙ্গে পাহাড়ে বেড়াতে গেছে ছেলেমেয়েরা। তরতর করে উঠে যাচ্ছে রতন, ইলিয়াস, রাবেয়া, তিতলি, জেমসরা। দিদিমণি ওদের সঙ্গে পেরে উঠছেন না। তিতলি একটা বাঁকের পিছনে গিয়ে ঝোপের পিছনে লুকিয়ে পড়ল। তাকে না দেখে রতন বলল— তিতলি কই ?

ইলিয়াস তাকে খুঁজতে ছুটল। অনেকটা এগিয়েও তিতলিকে পেল না। এবার পিছন থেকে হাসতে হাসতে এগিয়ে এল তিতলি। বলল— ঝোপের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় একবার তাকালি না? আমি তো লুকিয়েছিলাম।

ঘণ্টাখানেক ধরে হইহই হলো। তারপর সবাই নামতে শুরু করল। রিমঝিম আর মিঠাই আস্তে আস্তে নামল। জেমস বলল— পাহাড়ে চড়া খুব মজার! আবার একদিন আসব।

রিমরিম খুব রোগা। সে হাঁপাচ্ছিল। বলল — আমি স্বাস্থ্যটা ভালো করে ফেলব। পরেরবার আর হাঁপাব না। মিঠাই খুব মোটা। সে বলল আমি খাওয়া-দাওয়া বদলে ফেলব। পরেরবার তোদের মতনই ছুটব, দেখিস!

দিদি বললেন— এই তো চাই! কী কী করলে স্বাস্থ্য ভালো হয় তা তোমরা জানো। সেভাবে সব কিছু করো। পরেরবার আর কেউ হাঁপাবে না। আর তোমাদের সবার স্বাস্থ্য সম্পদ হয়ে উঠবে!

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

কী কী করলে স্বাস্থ্য ভালো হয়? তুমি কী কী করো, কী কী করো না? নীচে লেখো:

কী কী করলে স্বাস্থ্য ভালো হয়	এর মধ্যে কী কী তুমি করো	এর মধ্যে কী কী তুমি করো না

স্বাস্থ্যই সম্পদ

দিদিমণির কথাটা ভাবতে ভাবতে বাড়ি পৌঁছোল জেমস। ওর কাকা তখন ব্যায়াম করছেন। তার ছাত্রছাত্রীরা দেখছে। এরপর ওরা নিজেরাও ব্যায়াম করবে। এবার জেমস বুঝল, কাকার স্বাস্থ্য তাঁর সম্পদ। সুন্দর

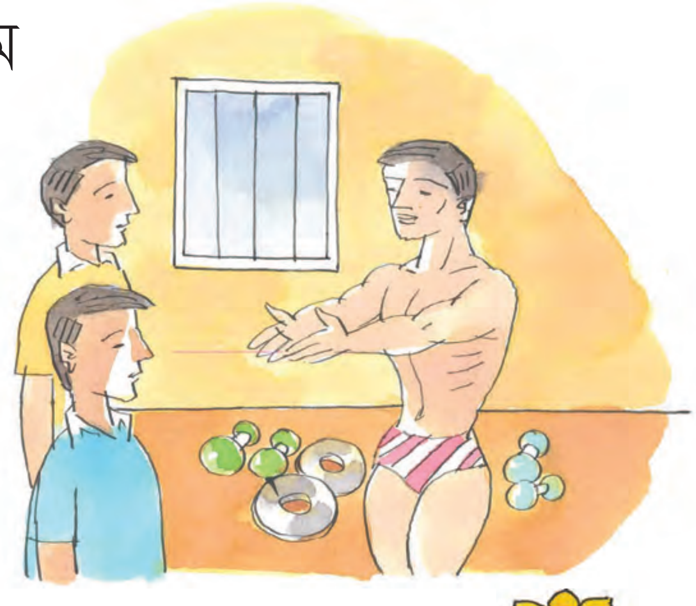

স্বাস্থ্যের জন্য কাকার কত সুবিধে। এত কাজ করেন। তাও হাঁপান না। এই সেদিন এক হাজার মিটার দৌড়ে মেডেল পেলেন!

স্কুলে গিয়ে জেমস তার কাকার কথা বলল।

দিদিমণি বললেন— সুস্থ শরীরই আমাদের সম্পদ হতে পারে। তার জন্য কয়েকটা নিয়ম মেনে চলতে হয়।

জেমস বলল— কাকা বলেন, সময় মেনে ঠিকঠাক খাবার খাওয়া, জল খাওয়া আর ব্যায়াম করা দরকার।

টিকাই বলল— সাঁতার কাটাও খুব দরকার। তাতে ব্যায়াম হয়। ভালো ঘুমও হয়। শরীর আরো ভালো থাকে।

রিমঝিম বলল— আমি আজ সকালে তিন গ্লাস জল খেয়েছি। এবার থেকে রোজই ঠিকঠাক জল খাব।

— হ্যাঁ, ঠিকঠাক জল খাওয়া খুব দরকার।

মিঠাই বলল— আমি ডাঁটা-চচ্চড়ি দিয়ে ভাত খেয়েছি। শশা খেয়েছি।

— বাঃ! খুব ভালো। যা পাবে তাই খাবে। কী করতে হয় তা তোমরা বেশ জানো। শরীর ভালো থাকলে সব কাজই

আনন্দের। শরীর খারাপ হলে কাজের উদ্যমে ঘাটতি হয়।

চিত্ত বলল--- আমার ঠাকুরদাও তাই বলতেন।

— তোমরা চেষ্টা করো যাতে তোমাদের সবার স্বাস্থ্যই নিজের নিজের কাছে সম্পদ হয়ে ওঠে।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

তোমার চেনা মানুষদের কার স্বাস্থ্য ভালো আর কার স্বাস্থ্য খারাপ? নিজেরা বুঝে নীচে লেখো:

চেনা মানুষের নাম / সম্পর্ক	স্বাস্থ্য ভালো, নাকি খারাপ	কেন এমন ভাবছ

চাই জল, চাই বায়ু, মাটি ও আকাশ

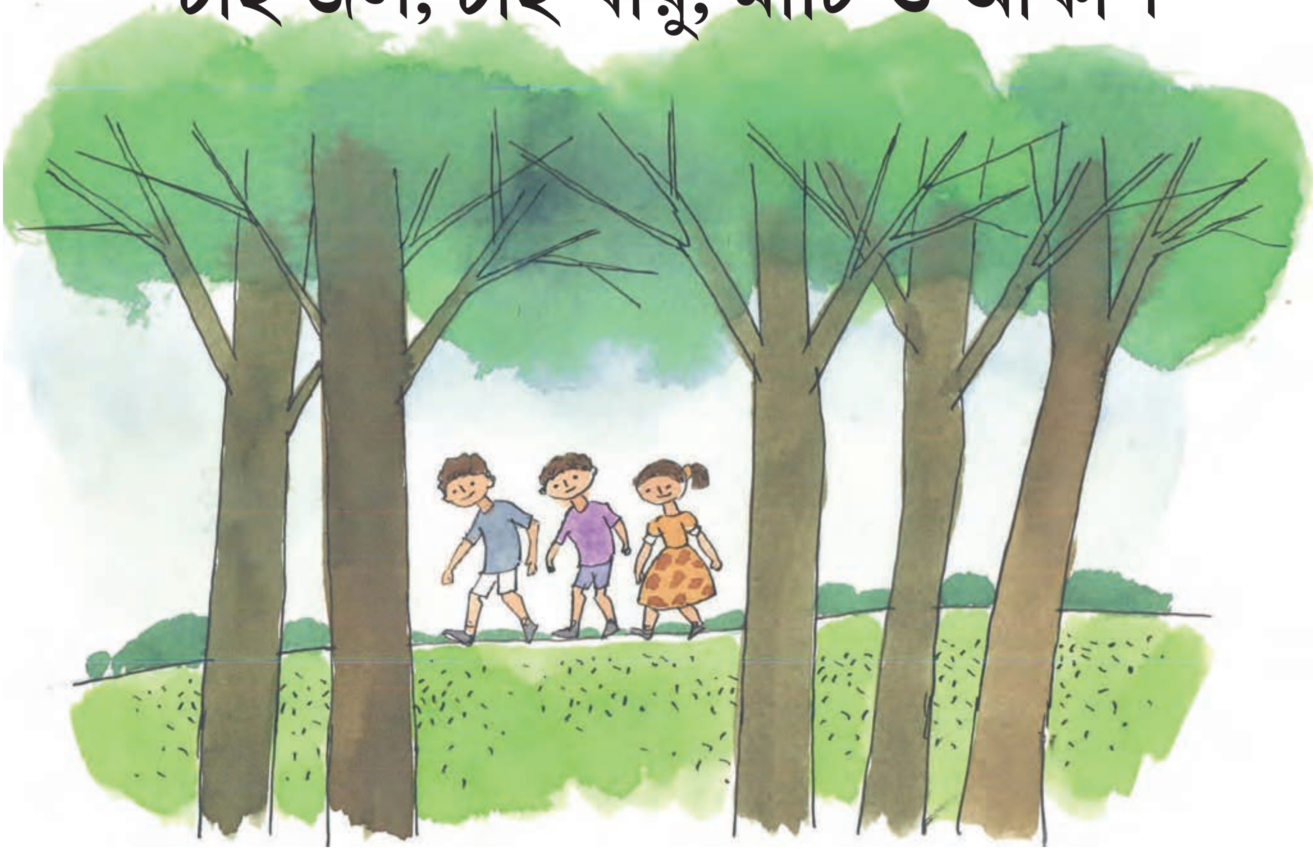

স্বাস্থ্য ছাড়া আর কী আমাদের সম্পদ? আর কী ভালো থাকলে আমাদের সুবিধে হয়? পুকুরের জল নোংরা হলে স্নান করতে ভালো লাগে না। জলে খারাপ গন্ধ থাকলে খাওয়ার সময়

বমি পায়। পরিষ্কার জল কি তাহলে আমাদের সম্পদ?

বাতাসে ধোঁয়া থাকলে চোখ জ্বলে। ধুলো থাকলে শ্বাসকষ্ট হয়। ঠান্ডা বাতাস শরীর জুড়িয়ে দেয়। তাহলে পরিষ্কার বায়ুও কি আমাদের সম্পদ?

মাটি নোংরা হলে চলাফেরার অসুবিধা হয়। পলিথিন পড়ে থাকলে তলার মাটি রোদ-হাওয়া-জল পায় না। উর্বর মাটিতে গাছপালা তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে। মাটিও কি আমাদের সম্পদ?

এইসব ভাবতে ভাবতে চিত্ত স্কুলে গেল। জল, মাটি, বায়ু নিয়ে নিজের ভাবনার কথা বলল। দিদিমণি চিত্তর খুব তারিফ করলেন। বললেন— জল, বায়ু, মাটি এসবই প্রকৃতির প্রধান সম্পদ। জন্মেই আমরা প্রকৃতি থেকে এসব পাই।

রিনা বলল— দিদি, বনের গাছও তো কেউ লাগায় না।

— ঠিক বলেছ। বনের গাছপালাও প্রকৃতির সম্পদ। সুযোগ পেলেই তোমরা গাছ লাগাবে। পারলে ফলের

গাছ। তাতে তোমাদেরও ফল খাওয়া হবে। আবার পশু-পাখিরাও সেই ফল খেতে পাবে।

রিম্পা বলল— তবে জল, বায়ু, মাটি আর সূর্যের আলো ছাড়া গাছ জন্মাতে পারে না।

— ঠিক। তাই ওগুলো প্রকৃতির প্রধান সম্পদ।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

প্রকৃতিতে আরো সম্পদ আছে। সেগুলোর বিষয়ে নীচে লেখো:

প্রকৃতির সম্পদের নাম	কোথায় আছে	কী করলে তা নষ্ট হয়ে যাবে	কী করলে সেই সম্পদ টিকে থাকবে

জল ধরো, জল ভরো, জল বাঁচাতে চেষ্টা করো

টিউবওয়েল টিপে জল তুলছিল কৃষ্ণা। সে ভাবল, মাটির নীচের জল কখনও শেষ হবে না। মাঠে এত মিনি ডিপ টিউবওয়েল বসেছে। তবু তো জল শেষ হয় না!

স্কুলে গিয়ে কৃষ্ণা সবাইকে একথা বলল। শুনে হারান বলল— একদম ভুল। আমার পিসিদের পাড়ায় মিনিতে জল উঠছে না।

দিদিমণি বললেন— ঠিকই। মাটির নীচের জল তোলা সহজ। কিন্তু নীচে জল পাঠানো সহজ নয়। নদী-সাগরের কাছাকাছি অঞ্চলে মাটির নীচে কিছুটা জল যেতে পারে। কিন্তু দূরের জায়গায় সে সুযোগ নেই।

কৃষ্ণা বলল— তাহলে কলের জল নষ্ট করা তো খুব খারাপ।

— বটেই তো। যথাসম্ভব বৃষ্টির জল দিয়ে চাষ করা দরকার। পুকুরগুলো গভীর করে কাটা দরকার। পাশে গাছ লাগানোও দরকার। শীতকালে সেই জল দিয়ে চাষ করা উচিত।

— দিদি, লোকেরা সজলধারার ট্যাপকল খুলে রাখে। ওই জল কোথা থেকে আসে?

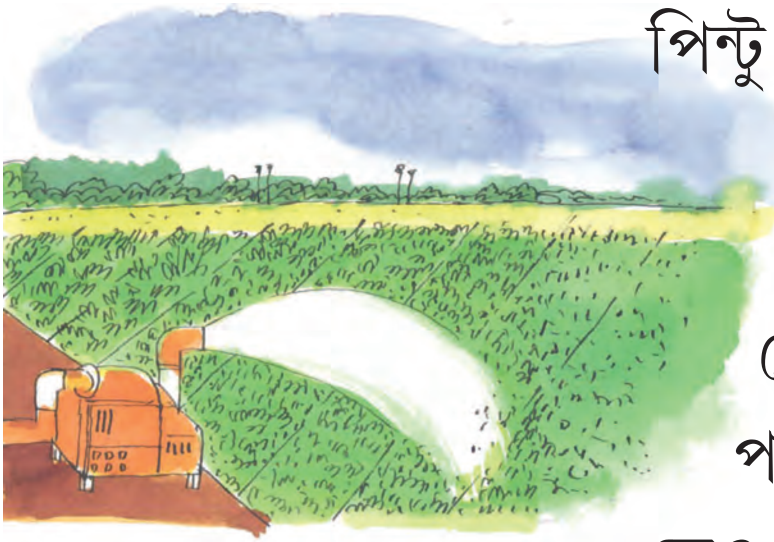

পিন্টু বলল--- দেখিসনি? ডিপ টিউবওয়েল দিয়ে জল তোলে। সেই জল পাইপ দিয়ে পাঠায়।

— সেও তো মাটির নীচের জল! এমন করে নষ্ট করে?

— তোমরা সবাইকে বোঝাবে। কেউ যেন জলের কল খুলে না রাখে। কোথাও জলের কল খোলা দেখলে বন্ধ করে দেবে। দেখবে কেউ যেন জলের কল ভেঙে না দেয়।

— দিদি, আমার মাসির বাড়িতে জলের অভাব। মাসিরা ফুলগাছের গোড়ায় কাঁচা আনাজ ধোওয়া জল দেয়।

— এই রকমই করা দরকার। মাটির নীচের জল যত বাঁচে ততই ভালো। না হলে পরে খাবার জল পাওয়া মুশকিল হবে। তোমরা যখন বড়ো হবে তখন হয়তো দেখবে মাটির নীচে খাবার জল আর নেই!

আমিনা বলল— দিদি, বৃষ্টির সময় আমরা ছাদের জল ধরে স্নান করি।

— বাঃ! তোমরা অনেকেই জল বাঁচাও। এখন থেকে সবাই যত পারো জল বাঁচাতে চেষ্টা করো।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

তোমরা কে কীভাবে জল বাঁচাও? জল বাঁচাতে আর কী কী করা যায় তা নীচে লেখো :

মাটির নীচের জল দিয়ে কী কী করো	ওই জল বাঁচাতে কী কী করো	ওই জল বাঁচাতে আর কী কী করতে পারো

সবুজ সম্পদের ডাক

তৃপ্তিদের অনেক আম গাছ। আগে এসব গাছ লাগানো হতো না। নতুন গাছগুলো ঠাকুরদা লাগিয়েছেন। তৃপ্তি ভাবল, যে গাছগুলো এমনিতেই হয়েছে সেগুলো প্রকৃতির সম্পদ। যেগুলো আলাদা করে লাগানো সেগুলো মানুষের তৈরি সম্পদ। স্কুলে গিয়ে একথা বলল তৃপ্তি। ওর কথা শুনে করিম বলল--- আমাদেরও ওইরকম গাছ আছে। বাগানে বকুলগাছ আছে। কেউ লাগায়নি। কয়েকটা নারকেলগাছ অনেক পুরোনো। কেউ লাগায়নি। গোলাপজাম গাছগুলো, কাঁঠালিচাঁপা গাছটা কেউ লাগায়নি। আবার কিছু নারকেলগাছ, আমগাছ দাদা লাগিয়েছে।

দিদিমণি সব শুনলেন। তারপর বললেন--- এখন ফল-ফুলের ব্যাপারটা এই রকমই। কিছু মানুষের তৈরি করা সম্পদ। কিছু আবার প্রকৃতিই তৈরি করে রেখেছে।

যেমন স্কুলের মাঠের ছাতিম, শিরীষ, শিমুল, বেল— এই গাছগুলো লাগানো হয়েছে। কিন্তু পুকুরপাড়ের বাঁশগুলো কেউ লাগায়নি।

— দিদি, এখন বলছেন কেন? আগে অন্যরকম ছিল?

— হ্যাঁ। আগে তো সব ফল-ফুলই প্রাকৃতিক সম্পদ ছিল। বনের গাছের মতো। মানুষ তখন বনের ফলমূল খেয়েই থাকত।

একথা ওরা সবাই জানে। হামিদ বলল— এখন অনেক ফুল-ফল একেবারে ধান-পাটের মতো চাষ হয়। গোটা একটা পেয়ারা বাগান। ছোটো ছোটো গাছ। কোথাও আবার খেত ভরতি গাঁদা ফুল! পরেশকাকু ঘৃতকুমারী, বাসক, কালমেঘ গাছ লাগান। বলেন, এর থেকে ওষুধ পাওয়া যায়।

বীণা বলল— আমার মামার বাড়ির কাছে বড়ো বড়ো আম বাগান। দাদু বলে সব গাছই দুই-তিনশো বছর

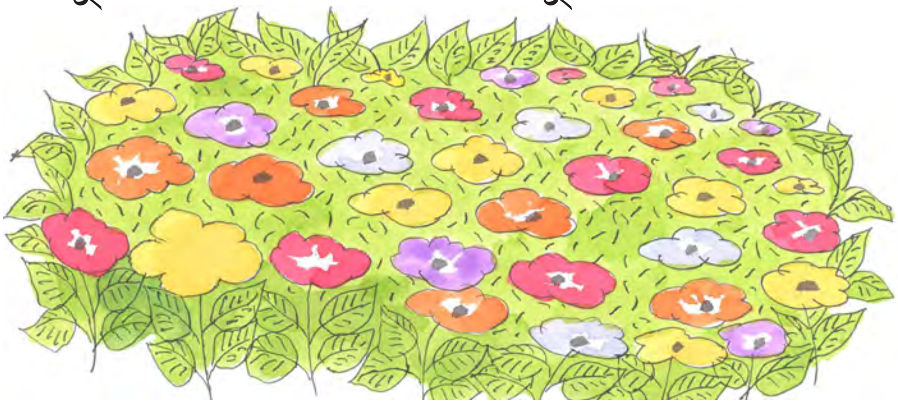

আগের। কেউ ওসব গাছ লাগায়নি।

— তাহলে ওগুলো প্রাকৃতিক সম্পদ। চাষ করে যা হয় সেগুলো কৃষি-সম্পদ। বাগানের ফল বাগিচা-সম্পদ।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

সম্পদের মধ্যে কোনগুলো প্রাকৃতিক? কোনগুলো মানুষের তৈরি? সেগুলো কোথায় পাওয়া যায়? নীচে লেখো:

ফুল-ফল-ফসলের নাম	কোথায় পাওয়া যায়	এটা কী ধরনের সম্পদ

একটি গাছ অনেক প্রাণ

গাছ লাগানোর উৎসবে সবাইকে গাছ লাগাতে হবে। খুব মজা।

বিপাশা বলল — কিন্তু উৎসব করে গাছ লাগানো হয় কেন?

দিদিমণি বললেন — গাছ যে জীবেদের নানা উপকার করে।

সাথী বলল — ঠিকই তো। গাছ থেকে আমরা ফুল পাই, ফল পাই, শাকসবজি পাই।

রাবেয়া বলল — গাছ থেকে আমরা যে শুধু খাবারই পাই, তাই নয়। আমাদের বাড়ির পাশের আমগাছে অনেকগুলো পাখির বাসা আছে।

সুখেন বলল — একটা গাছে আমি পিঁপড়ের বাসাও দেখেছি।

রবি বলল — গরমকালে দুপুরে গাছের তলায় ছায়াতে বসলে খুব আরাম লাগে।

রূপা বলল — আমাদের বাড়ির খাট, আলমারি, দরজা, জানলা সবই কাঠের তৈরি।

মজিদ বলল — নৌকো তো গাছের কাঠ দিয়েই তৈরি হয়।

— কাগজ তৈরি করতেও অনেক বাঁশ লাগে। অন্যান্য গাছের বিভিন্ন অংশও লাগে।

রূপা বলল — দিদি, তাহলে তো কাগজ বানাতে অনেক গাছ কাটার দরকার হয়?

— হ্যাঁ। তাইতো শুধু শুধু কাগজ নষ্ট করা উচিত নয়। তাহলে বেশি বেশি গাছ কাটতে হবে।

প্রশান্ত বলল — তাহলে তো আমাদের বইগুলোকেও যত্ন করে রেখে দেওয়া দরকার।

— কাগজ ব্যবহারের পর নোংরা হয়ে যায়। কখনও কখনও পচে যায়। তাই দিয়েও আবার কাগজ বানানো যায়।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

বিভিন্ন জীব গাছের থেকে কী কী পায়? মানুষ কীভাবে কাগজের ব্যবহার করে? সেসব নীচে লেখো।

জীবের নাম	গাছ থেকে কী কী পেতে পারে
পাখি	
বাঁদর	
পিঁপড়ে ও মৌমাছি	

কী কী ভাবে কাগজ নষ্ট হয়?	
কী কী ভাবে কাগজ বাঁচানো সম্ভব?	
তোমরা কীভাবে কাগজ ব্যবহার করো ও কাগজ বাঁচাও?	

হাতে গড়া শিল্প-সম্পদ

মানুষের তৈরি আরো কত কী আমাদের কাজে লাগে। মাটির ভাঁড়, কলসি, লোহার কোদাল, আরও কত কী। এগুলোও সব মানুষের তৈরি সম্পদ। এগুলো তো কৃষি-সম্পদ নয়! স্কুলে সঞ্জীব একথা বলল।

শুনে তড়িৎ বলল— পিতলের বাসনও তো মানুষের তৈরি।

দিদিমণি বললেন— এগুলো সবই শিল্প সম্পদ। ছোটো ছোটো ঘরোয়া শিল্প। তোমাদের কাছাকাছি জায়গায় এসব শিল্প রয়েছে।

ঝুম্পা বলল--- বাঁশের ঝুড়ি, ঘাসের মাদুরও কি শিল্প-সম্পদ?

রাবেয়া বলল— বাঁশ তো বাগানে হয়। ঘাস হয় মাঠে। এগুলো প্রাকৃতিক-সম্পদ বা কৃষি-সম্পদও হতে পারে।

— বাঁশ চাষ করলে তা কৃষি-সম্পদ। সেটা ঝুড়ি তৈরির কাঁচামাল। কিন্তু ঝুড়ি তৈরি করা হাতের কাজ। মাদুর বোনাও তাই। ঘাস মাদুরের কাঁচামাল।

— হাতের কাজ কি শিল্প?

--- এগুলো ঘরোয়া শিল্প। ভালো কথায় বলে কুটির শিল্প। এই ধরনের কাজ দিয়েই শিল্পের শুরু।

রতন বলল— কাঠের চেয়ার-টেবিল তৈরি করা?

— সেটাও হাতের কাজ।

— আচ্ছা দিদি, বাড়ি তৈরি করাও কি শিল্প?

— হ্যাঁ। বাড়ি তৈরি করাকে বলে নির্মাণ-শিল্প।

মাম্পি বলল— বড়ি? বড়ি তৈরি করা কি শিল্প?

— হ্যাঁ। হাতের কাজ বা ঘরোয়া শিল্প। এই রকম অনেক ধরনের ছোটো শিল্প তোমরা দেখেছ।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

তোমরা নানান ঘরোয়া শিল্প, ছোটো শিল্প বা হাতের কাজ বিষয়ে জানো বা দেখেছ। সেসব নীচে লেখো:

সম্পদের নাম	কী কী দিয়ে তা তৈরি হয়	সেটা কী ধরনের সম্পদ

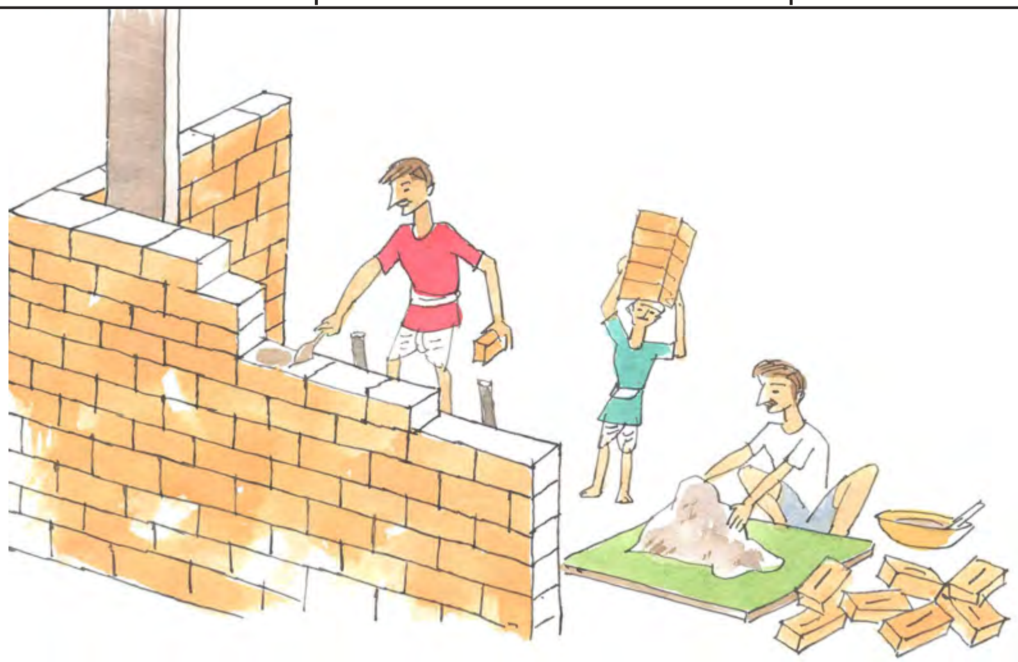

হরেকরকম শিল্পকথা

ইটখোলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল স্বপন। পঁচিশ-তিরিশজন লোক ইট তৈরি করছেন। দশ-পনেরোজন রোদে ইট মেলছেন। আট-দশজন রোদ থেকে তুলছেন। আর পনেরো-কুড়িজন ভাটার ভিতর থেকে পোড়া ইট বের করে সাজাচ্ছেন। স্বপন ভাবল, ইটখোলা কি ঘরোয়া শিল্প?

একটা চালকলের পাশে ইলিয়াসদের বাড়ি। সেখানে অনেক কাজ হয়। বয়লারে ধান ঢালা, সিদ্ধ ধান শুকোতে দেওয়া, ধান নাড়া। কত কাজ! সব মিলে ষাট-সত্তরজন কাজ করেন। ইলিয়াস মাঝে মাঝে দেখে আর ভাবে, চালকলটা কি ঘরোয়া শিল্প?

স্কুলে ওরা সব বলল। দিদিমণি বললেন— বাঃ। বেশ দেখেছ তো। এগুলো একটু বড়ো মাপের শিল্প। সবাই কাছাকাছি এরকম শিল্প দেখে আসবে। তারপর কী দেখলে তা অন্যদের বলবে।

দিদি একটু বড়ো মাপের বলতে কী বোঝাতে চাইলেন সেটাই স্বপন ভাবল। তারপর বলল— দিদি, আরো বড়ো মাপের শিল্প আছে?

— আছে তো। মানুষ কত জিনিস তৈরি করেছে। সেগুলো তৈরি করতে বড়ো বড়ো মেশিন লাগে। একটু ভাবো। কোন কোন জিনিস তোমরা ব্যবহার করো। কিন্তু তৈরি করা দেখোনি।

অর্ণব বলল— সিমেন্ট, বিদ্যুৎ!

— ঠিক। এছাড়া বড়ো বড়ো মেশিন, গাড়ি তৈরি করেছে মানুষ।

— মশলা মাখার মিক্সার, রাস্তা তৈরির রোলার, ট্রাকটর, পাওয়ার টিলার!

— ঠিক। এইসব মেশিন তৈরির শিল্পগুলোই বড়ো শিল্প।

ঘরোয়া শিল্পের নানান কথা

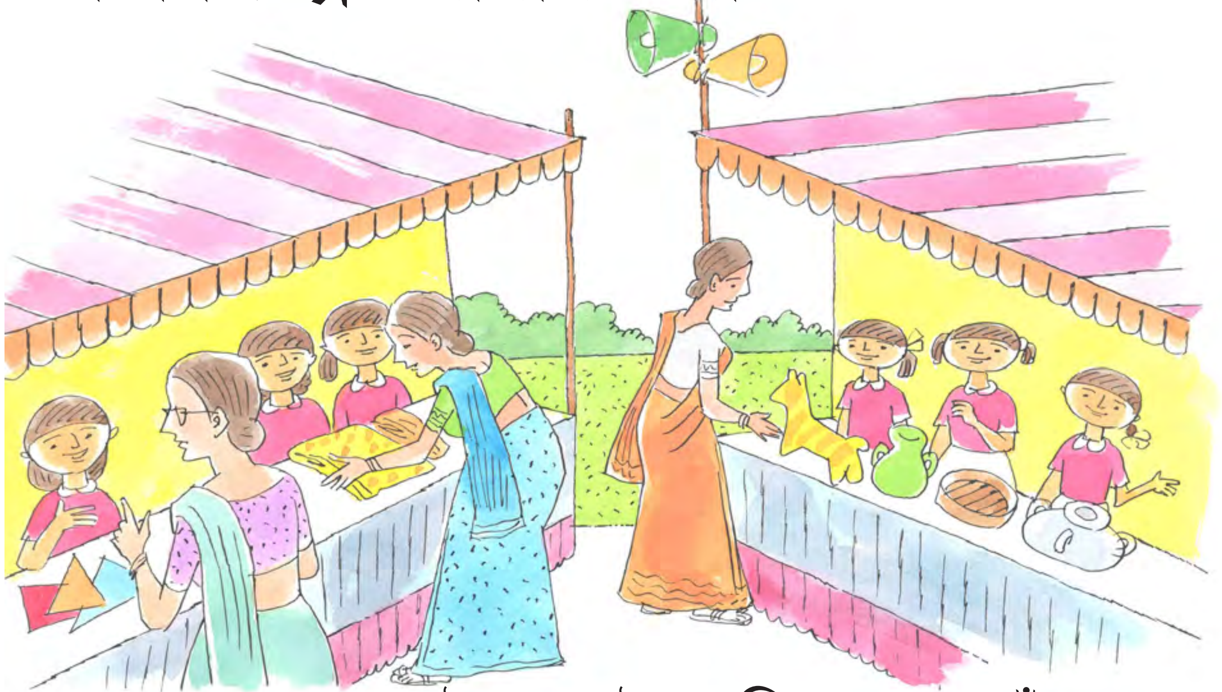

রাবেয়াদের ঘরে একটা ছোটো ঝুড়ি আছে। বাঁশের সরু সরু বাখারি দিয়ে তৈরি। ফুল কাটা, ঢাকা লাগানো, সুন্দর। কোনো কাজে লাগে না। কিন্তু মা মাঝে মাঝে পরিষ্কার করেন। আবার তুলে রাখেন।

স্কুলের ছেলেমেয়েরা ওদের হাতের কাজ নিয়ে প্রদর্শনী করবে। আজ তাই নিয়ে ক্লাসে কথা উঠল।

রাবেয়া স্কুলে ওই ঝুড়িটার কথা বলল। তারপর বলল— দিদি, ওই ঝুড়িটা তো কাজে লাগে না। ওটা কি শিল্প-সম্পদ?

দিদিমণি বললেন— কেন? ওটা দেখার কাজে লাগে! ওটা দেখে ভালো লাগে!

রবি বলল— ওরকম তো কত জিনিস আছে। দেখতে ভালো, শো কেসে সাজিয়ে রাখতে হয়।

তুহিন বলল— আমাদের ঘরে ঝিনুক দিয়ে তৈরি একটা পুতুল আছে।

রাবেয়া বলল— এগুলোও হাতের কাজ, ঘরোয়া শিল্প?

— শুধু হাতের কাজ নয়। এগুলো হাতের সূক্ষ্ম কাজ। একটু অন্য অর্থে শিল্প।

রবি বলল— বুঝেছি। ছবি আঁকার মতো। শিল্পীরা ছবি আঁকেন।

মিন্টু বলল— নাটকে যারা অভিনয় করেন, তাঁরাও শিল্পী।

তুহিন বলল— মিন্টুর ইচ্ছা ও নাটকে অভিনয় করবে!

— সে তো ভালোই। স্পষ্ট উচ্চারণে কথা বলা অভ্যাস করো। শরীরের ভঙ্গিতে কীভাবে মনের ভাব বোঝাতে হয় তা শেখো। একসময় দেখবে অভিনয় করার সুযোগ পাবে।

তিয়াসা বলল— রমেশকাকু পাথর খোদাই করে মূর্তি তৈরি করেন। সেও তো সূক্ষ্ম কাজের শিল্প।

— বেশ বলেছ তো! এসব হলো সুন্দর কিছু করার শিল্প। সৌন্দর্য সৃষ্টির শিল্প। মনে আনন্দ দেওয়ার শিল্প। এমন শিল্প-সম্পদ তোমাদের চারপাশে ছড়িয়ে আছে।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

১। নানা ধরনের শিল্প-সম্পদের কথা তোমরা জানো। এবার নীচে সেসব লেখো:

শিল্প-সম্পদের নাম	তৈরি করা দেখেছ কিনা	চেনা অন্য কেউ দেখেছেন কিনা	কী ধরনের শিল্প-সম্পদ

২। তোমাদের চারপাশের শিল্প-সম্পদগুলো খেয়াল করো। এবার তা সারণীতে লেখো:

সুন্দর শিল্প-সম্পদের নাম	কী দিয়ে তৈরি	কোথায় দেখেছ	কে বা কারা তৈরি করেছেন

সজাগ থেকো, ভুলে যেও না (১)

কুমকুম খুব ভালো মেয়ে। সব নিয়ম মেনে পথে চলে। গাড়িগুলোকে মুখোমুখি রেখে ডান দিক দিয়ে হাঁটে। যাতে সামনের দিক থেকে আসা গাড়িগুলোকে খেয়াল করতে পারে। ফুটপাত থাকলে তার উপর দিয়েই হাঁটে।

রাস্তা পেরোতে হবে? আগে দু-দিক দেখে নেয়। কোনো দিক থেকে গাড়ি আসছে কিনা। শহরের রাস্তা পেরোয়

জেব্রা ক্রসিং দিয়ে। রাস্তা পারাপারের মানুষের ছবি দেওয়া সিগন্যাল সবুজ দেখালে তবেই পেরোয়। রাস্তা পেরোনো সময় বড়োদের হাত শক্ত করে ধরে রাখে। চলন্ত গাড়ি থেকে লাফিয়ে নামে না। কেউ মোবাইল ফোনে কথা বলতে বলতে রাস্তা পার করলে বারণ করে। মোটর বাইকে চাপলে হেলমেট পরে নেয়।

জেব্রা ক্রসিং কী জানো তো? রাস্তায় জেব্রার গায়ের মতো দাগ থাকে। সেটাই জেব্রা ক্রসিং। গতকাল কুমকুম কলকাতায় গিয়েছিল। সিগন্যালে মানুষের ছবি সবুজ হওয়ার পরেই রাস্তা পেরিয়েছে।

পথে যেতে যেতে ঝড় এলে কুমকুম গাছতলায় দাঁড়ায় না। ঝড়ের সময় কার মাথায় নাকি গাছের ডাল ভেঙে পড়েছিল। সেটা শুনেই ও খুব সাবধান হয়ে গেছে। ঝড় এলেই ছুটে যায় কাছাকাছি কোনো বাড়ির বারান্দায়।

একদিন ফাঁকা মাঠ দিয়ে এক বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছে কুমকুম আর রিম্পা। হঠাৎ শুরু হলো বাজ পড়া। কুমকুম শুনেছে উঁচু গাছে বাজ পড়ে। দাঁড়িয়ে থাকলে বাজ যদি ওদের উঁচু গাছ ভাবে! তাই ও রিম্পাকে মাটিতে হাত-পা জড়ো

করে ও মাথা নিচু করে বসে পড়তে বলল। নিজেও একইভাবে বসে পড়ল।

খানিক পরে বাজ পড়া কমল। তবে বৃষ্টি কমল না। বন্ধুর বাড়ি পৌঁছতে সপসপে ভিজে গেল দু-জনে। বন্ধুর জামা ওদের একটু ঢিলে হলো। তবু ওরা তার থেকে জামা নিয়ে পরল। শুকোনোর আগে আর নিজেদের ভিজে জামা পরল না। কুমকুম বলল— ভিজে জামা পরলে পরপর অনেক কষ্ট। হাঁচি, গলা খুশখুশ, নাকে জল। সাতদিনের ধাক্কা। কুমকুম এত জানে। তবু সবার কাছে জানতে চায়। চলাফেরায় আরো কীভাবে সাবধান হবে?

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

সাবধানে চলাফেরা করার জন্য কুমকুমের আর কী কী করা উচিত? নীচে তোমাদের পরামর্শগুলো লেখো:

সমস্যা	কী করলে ভালো হয় বলে ভাবছ
পায়ে চামড়ার জুতো, রাস্তায় জল জমেছে	
রাস্তা পেরোতে গিয়ে সিগন্যালের আলো হঠাৎ লাল হয়ে গেছে	
হেলমেট ছাড়া মোটর বাইক চালাচ্ছে	
চলন্ত গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নামছে	
গাড়ি খেয়াল না করে রাস্তা পারাপার করছে	

সজাগ থেকো, ভুলে যেও না (২)

দরকার মতো কুমকুম মায়ের হাতে হাতে একটু আনাজ কাটে। আগে ধোয়, তারপর খোসা ছাড়ায়। কেটে নেয়। শেষে বঁটির ধারালো দিকটা দেয়ালের দিকে করে রাখে। পরে আবার সেখান থেকে নেয়।

কুমকুমের নেলকাটার নেই। ব্লেড দিয়েই নখ কাটে। কিন্তু খুব সাবধানে কাটে। আগে নখগুলো ভালো করে ভিজিয়ে নরম করে নেয়। তারপর অল্প চাপ দিয়েই নখ কাটে। ওর মামা একবার শুকনো নখ কাটার চেষ্টা করে বিপদ বাধিয়েছিলেন। শক্ত নখ। খুব জোর করে কাটছিলেন।

কাঁচা নখ আর চামড়ার খানিকটা কেটে গিয়েছিল। রক্ত বেরোয়। ইনজেকশন নিতে হয়েছিল। একথা শুনেই কুমকুম সাবধান হয়ে গেছে।

টুকুনের একটা ছোট্ট কোদাল আছে। সেটা দিয়ে ও বাগানে মাটি কোপায়। ফুল, লঙ্কা, বেগুনের চারা লাগাতে হবে যে! কাকা ওকে মাটি কোপানোর কৌশল দেখিয়ে দিয়েছেন। এমনভাবে দাঁড়ায় যে পায়ে কোদাল লাগবে না।

দরজা-জানালা বন্ধ করার সময় টুকুন খুব সাবধানি। সে একবার দেখেছিল, একটা টিকটিকির লেজ দরজার পাল্লার চাপে কেটে গেল। তারপর থেকে সে দরজা বন্ধ করার সময় আগে খেয়াল করে অন্য হাতটা দরজায় চাপ খেতে পারে কিনা!

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

তোমরা কোন কাজে কীভাবে সাবধান হও ? নীচে লেখো :

ঘরোয়া কাজের নাম/বিবরণ ইত্যাদি	কীভাবে সাবধান হবে

সজাগ থেকো, ভুলে যেও না (৩)

ইলেকট্রিকের সুইচে হাত দেওয়ার আগে কুমকুম সবসময় হাত মুছে নেয়। হাতে যেন জল না থাকে। জল থাকলে শক লাগতে পারে। ইস্ত্রি করার সময়ে ও খুব সাবধান থাকে। সুইচ অফ না করে ইস্ত্রিতে হাত ছোঁয়ায় না। যদি ইস্ত্রিটা খারাপ থাকে তাহলে শক লাগতে পারে।

একবার একটা প্লাগ কাজ করছিল না। কুমকুমের দাদা প্লাগের ফুটোয় তার ঢুকিয়ে দেখছিলেন, কী হয়েছে। আর জোর একটা শক খেয়েছিলেন। সেই থেকে কুমকুম সাবধান হয়েছে। প্লাগ কাজ না করলে টেস্টার দিয়ে দেখে। কখনও অন্য কিছু ঢোকায় না।

কুমকুম মোমবাতি জ্বালাতে পারে। এক হাতে দেশলাই বাক্স আর এক হাতে দেশলাই কাঠি নেয়। তারপর কাঠিটা জ্বালায়। এবার মোমবাতির পলতের কাছে দেশলাইয়ের শিখাটা ধরে। একবার কুমকুমের ছোটোমাসি মোমবাতির তলায় দেশলাই কাঠি ধরেছিলেন। মোম গলে গলে পড়েছিল। বাতি জ্বলেনি। তা দেখে কুমকুম শিখে নিয়েছে। শীতকালে কুমকুম নিজের স্নানের জল নিজেই গরম করে নেয়। আগে উনুনে এক ডেকচি জল বসায়। তারপর গ্যাসের উনুন জ্বালায়। দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে তবেই উনুনের নব ঘোরায়। জল গরম হয়ে গেলে গরম ডেকচি হাত দিয়ে ধরে না। একটা কাপড় দিয়ে ধরে। সেই জল বালতির ঠান্ডা জলে মিশিয়ে নেয়।

বাড়ির বাইরে গেলে কুমকুম সবসময়ে পায়ে চটি বা জুতো পরে। রাস্তায় যদি পায়ে কিছু ফুটে যায়! একবার ওর দাদা খালি পায়ে বাইরে গেছিলেন। পায়ে জং ধরা পেরেক ফুটেছিল। সেই থেকে কুমকুম খুব সাবধান হয়ে গেছে। বাইরে থেকে বাড়ি ফিরে আগেই ভালো করে হাত-পা ধুয়ে নেয়। নিজের জামাকাপড়েরও খুব যত্ন নেয় কুমকুম।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

ইলেকট্রিক আর আগুন নিয়ে কাজে তোমরা কীভাবে সাবধান হও? নীচে লেখো :

কাজের নাম / বিবরণ	কীভাবে সাবধান হও

প্রত্যেকে আমরা পরের তরে

সাঁতারু হিসেবে স্কুলে টিকাই-এর খুব নামডাক। কিন্তু ওর বন্ধুরা সবাই তেমন ভালো সাঁতরাতে পারে না। রাজু একবার জলে ডুবে যাচ্ছিল। ওকে বাঁচাতে টিকাই পুকুরে ঝাঁপ দিল। পলাশও ভালো সাঁতার জানে। সেও ঝাঁপ দিল জলে। রাজুর কাছাকাছি পৌঁছে টিকাই বলল— সাবধান। তুই আমায় জড়িয়ে ধরিস না। তাহলে দুজনকেই ডুবতে হবে!

তারপর টিকাই রাজুর হাতের কাছে একটা গামছা ছুঁড়ে দিল। রাজু সেটা জাপটে ধরল। গামছার অন্য দিক ধরল টিকাই। সাঁতার কেটে চলল। রাজুর পিছনে রইল পলাশ। ওকে ঠেলতে থাকল। এভাবে ওরা পাড়ের কাছে এল। তারপর ওকে জল থেকে তুলল। রাজু তখন কথা বলতে পারছে না।

এভাবে বেশিক্ষণ রাখা যায় না। তাই এরপর রাজুকে উপুড় করে শুইয়ে দিল টিকাই। দু-হাত দু-দিকে ছড়ানো। মাথাটা কাত করা। এবার ওর পিঠের দু-দিকে চাপ দিতে লাগল। বেশ কিছুটা জল বেরিয়ে গেল। এমনভাবে চলল মিনিটখানেক। তবুও রাজুর কোনো সাড়াশব্দ নেই। এবারে রাজুকে চিত করে শোয়ানো হলো। ওর নাকের কাছে টিকাই কান রাখল। কিন্তু কোনো নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পেল না। তখন রাজুর চিবুকটাকে প্রথমে একটু উঁচু করে দিল ওরা। আর রাজুর মাথাটা পিছন দিকে হেলিয়ে দেওয়া হলো। তারপর টিকাই রাজুর হাঁ করা মুখের ভিতর দুটো আঙুল ঢুকিয়ে দিল। তাতে একটু কাদা, আর দু-একটা ঝাঁঝি গাছের

পাতা বেরিয়ে এল। বুকভরে বাতাস টেনে নিয়ে রাজুর খোলা মুখের ওপর নিজের মুখটা চেপে ধরল টিকাই। তারপর সেই বাতাসটা ফুঁ দিয়ে পুরোটাই ঢুকিয়ে দিল রাজুর ফুসফুসে। পলাশ এক হাতের দু-আঙুল দিয়ে রাজুর নাকটা চেপে ধরে রেখেছিল। যাতে টিকাই-এর মুখের হাওয়াটা রাজুর নাক দিয়ে বেরিয়ে না যায়। এরকম দুই-তিন বার করবার পরও রাজুর কোনো সাড়া নেই। এর ভেতরে জেমসের কাকা ওদের দেখে দৌড়ে এসেছেন। কাকু বললেন— টিকাই, মনে হয় রাজুর হৃদযন্ত্র কাজ করছে না। দেখিতো, নাড়ির ছন্দ আছে কিনা! রাজুর গলার মাঝখানে উঁচু জায়গাটার পাশে একটা আঙুল দিলেন কাকু। মন দিয়ে অনুভব করার চেষ্টা করলেন। কাকুর কপাল কুঁচকে গেল। বললেন— না তো, রাজুর কোনো পালস নেই! টিকাই তাড়াতাড়ি করো। এবার মনে হচ্ছে রাজুর হৃৎপিন্ডে বাইরে থেকে চাপ দিতে হবে। সেভাবেই হৃৎপিন্ডের কাজ চালু করতে হবে।

টিকাই বলল— কাকু, আমি কি ওই শ্বাসপ্রশ্বাস চালাবার কাজটা করে যাব?

কাকু বললেন— হ্যাঁ। তুমি নিশ্বাসের কাজটা দেখো। আমি হৃৎযন্ত্রে চাপ দিই। এই বলে কাকু রাজুর পাশে হাঁটু গেড়ে বসলেন। পলাশকে বললেন— দেখো, রাজুর বুকের পাঁজরের সব থেকে নীচের হাড়দুটো মিশেছে এইখানে।

৪ ও ৫ নম্বর ছবির কাজগুলি পর্যায়ক্রমে করে যেতে হবে।

সেই জায়গা থেকে ঠিক দু-আঙুল ওপরে বুকের মাঝখানে ওই হাড়টার ওপর হাতদুটো দিয়ে চাপ দিতে লাগলেন কাকু। এমনভাবে চাপ দিলেন যাতে দু-ইঞ্চির মতো নামানো যায়। ‘এক-দুই-তিন-চার’ বলতে বলতে টানা একই ছন্দে চাপ দিতে লাগলেন। পলাশকে বললেন— প্রতি মিনিটে প্রায় ষাটবার এভাবে চাপ দিতে হয়। তাই এক-দুই-তিন করে গুনলে সুবিধা হয়। এরকমভাবে পনেরোবার হৃৎযন্ত্রকে চাপ দিতে থাকলেন কাকু। আর তার পরেপরেই দু-বার করে শ্বাসপ্রশ্বাস চালানোর চেষ্টা করতে থাকল টিকাই। কাকু আর টিকাই এই কাজ বারবার করতে থাকল। রিনা ততক্ষণে ডাক্তারবাবুকে ডেকে নিয়ে এসেছে। আর তখনই রাজু চোখ খুলে তাকাল। নিজে থেকেই নিশ্বাস নিচ্ছে মনে হলো।

কাকু দেখলেন, রাজুর গলার পাশে নাড়ির ছন্দ ফিরে এসেছে। রাজু যেন ঘুম থেকে উঠল। চারপাশে এতজনকে দেখে বলল— কী হয়েছিল আমার?

ডাক্তারবাবু হেসে বললেন— ভাগ্যিস তোমার বন্ধু টিকাই, পলাশ, রিনা আর কাকু ছিলেন। ওদের ধন্যবাদ দাও। না

হলে কী যে হতো ভাবতেই পারছি না। এবার থেকে সাঁতার না জানলে জল থেকে সাবধান থেকো।

পরদিন ডাক্তারবাবু টিকাইদের স্কুলে গেলেন। কেউ জলে ডুবে গেলে কী কী করতে হয় তা ছবি দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন। পাশের পাতায় ছবিগুলো দেওয়া হলো। সবাই ভালো করে দেখে নাও।

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

কেউ জলে ডুবে গেলে তাকে তুলতে হবে। তখন কীভাবে সাবধান হবে? পরে কী কী করবে? এসব নিয়ে তোমার ভাবনা নীচে লেখো :

কাজ	সাবধানতা
জল থেকে তোলার সময়	
পেটের জল বের করার সময়	
শ্বাস চালু করার সময়	
হৃৎপিন্ড চালু করার জন্য	

নীচের ছবিগুলো আঁকা রইল। তোমরা খুশিমতো রং দিয়ে ভরিয়ে দাও :

রং বাহার

নীচের ছবিগুলো আঁকা রইল। তোমরা খুশিমতো রং দিয়ে ভরিয়ে দাও :

র
ং
বা
হা
র

নীচের ছবি আঁকা রইল। তোমরা খুশিমতো রং দিয়ে ভরিয়ে দাও :

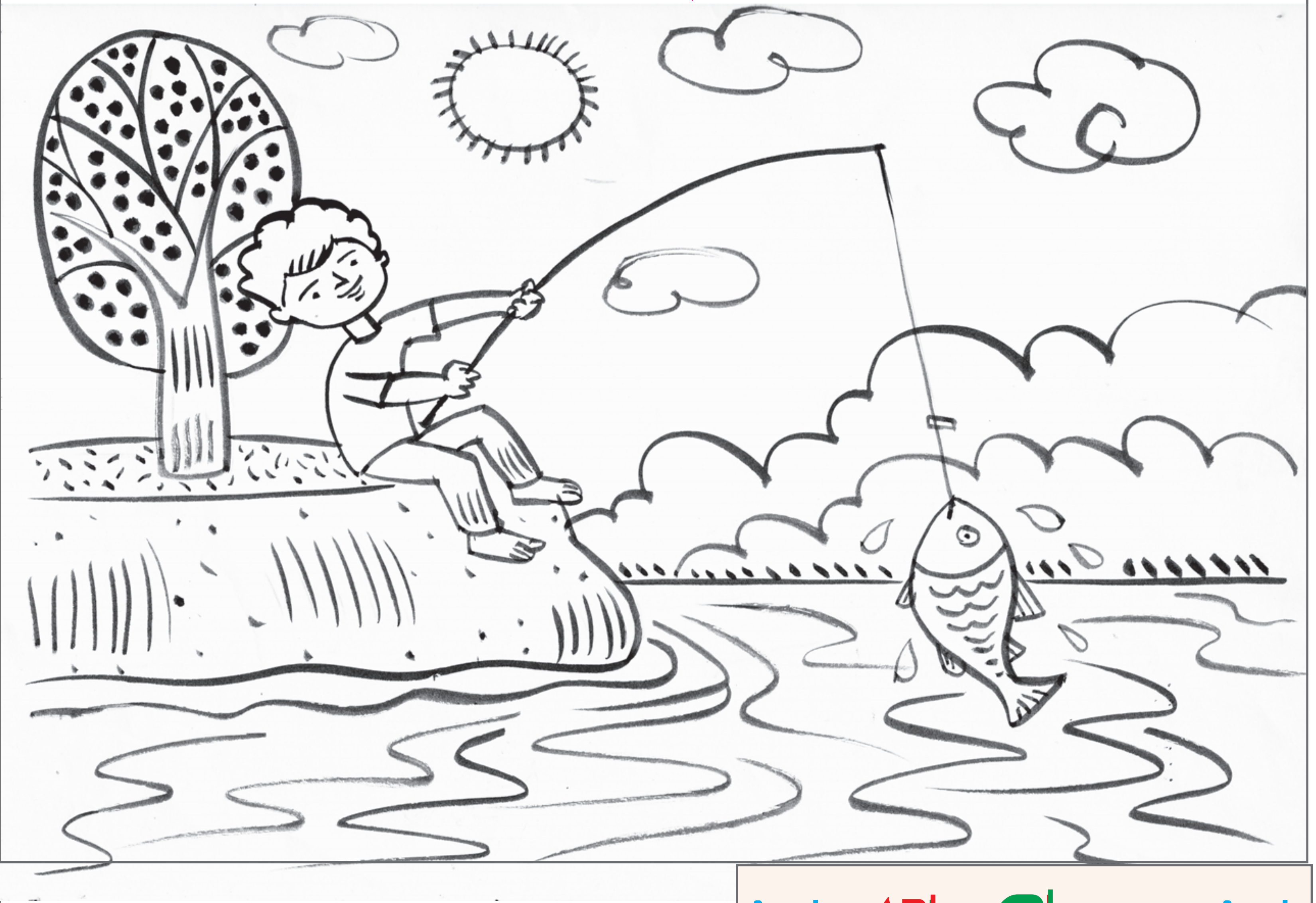

রংবাহার

আমার পাতা-১

এই বই তোমার কেমন লেগেছে? লিখে, এঁকে বুঝিয়ে দাও :

আমার পাতা-২

এই বই তোমার কেমন লেগেছে? লিখে, এঁকে বুঝিয়ে দাও :

আমাদের পরিবেশ (তৃতীয় শ্রেণি)

পাঠ্যসূচি

১. শরীর

ক) মানুষের দেহ : প্রধান বাহ্যিক অঙ্গ ও তাদের কাজ

খ) দেহের যত্ন ও সুঅভ্যাস গঠন

গ) হাঁটা, সাঁতার কাটায় ও খেলায় ব্যবহৃত অঙ্গের নাম

ঘ) বিভিন্ন ইন্দ্রিয় তাদের কাজ

ঙ) চেনা পরিবেশের অন্যান্য প্রাণীর শরীর

চ) মানুষের দেহের সঙ্গে অন্য প্রাণীদেহের মিল

২. খাদ্য

ক) মানুষের খাবার : আমাদের পরিচিত খাবারের নাম

খ) বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিজ্জ খাদ্যের নাম ও প্রাসঙ্গিক ধারণা

গ) বিভিন্ন প্রকার প্রাণীজ খাদ্যের নাম ও প্রাসঙ্গিক ধারণা

ঘ) প্যাকেট করা তৈরি খাদ্য

ঙ) রন্ধন

চ) খাদ্য বিনিময়

ছ) পশুপালন ও রন্ধন

৩. পোশাক

ক) মানুষের পোশাক : পরিধেয় বিভিন্ন পোশাক ও তার রং

খ) শীতকাল ও বছরের অন্যান্য সময়ের পোশাক

গ)	বর্তমান পোশাকের উপাদান ও উৎস

ঘ)	প্রাচীন মানুষের পোশাক

৪. বাসস্থান

ক)	মানুষের বাসস্থান : বিভিন্ন আকৃতির বাড়ি

খ)	বাড়ির ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের উপাদান

গ)	বাড়ির গঠনগত বিভিন্ন অংশ ও তার গুরুত্ব

ঘ)	বাড়ি তৈরিতে ব্যবহৃত উপাদান

ঙ)	আধুনিক মানুষের বাড়ি

চ)	বাড়ির পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের উপাদান

ছ)	দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চলের বাড়ি

জ)	প্রাচীন মানুষের বাড়ি

৫. পরিবার

ক)	পরিবার : পরিবারের সদস্য, তাদের নাম ও পারস্পরিক সম্পর্ক

খ)	মানুষের পরিবার : নিকট আত্মীয়দের নাম ও তাদের বাসস্থান

গ)	প্রাণীর পরিবার

ঘ)	বর্তমান মানুষের বাসস্থান

ঙ)	পরিবারের সদস্যদের জীবিকা পরিবর্তন

৬. আকাশ

ক)	দিন ও রাতের আকাশ

খ)	সূর্যের অবস্থান ও দিক নির্ণয়

গ)	সূর্য ও পৃথিবী

ঘ)	সূর্যের অবস্থান ও সময়ের পরিবর্তন

ঙ)	অমাবস্যা ও পূর্ণিমা

চ)	তারা বা নক্ষত্র

ছ)	মেঘ

জ)	আকাশে রঙের ছটা

৭. স্বাস্থ্য

ক)	সম্পদ ও স্বাস্থ্য

খ)	সম্পদ ও জল, বায়ু, মাটি

গ)	সম্পদ ও হাতের কাজ

৮. সাবধানতা

ক)	সাধারণ নিরাপত্তাবিধি : পথচলা

খ)	প্রতিদিনের ব্যবহার্য যন্ত্রপাতি ও নিরাপত্তাবিধি

তিনটি পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পাঠ্যসূচি

১) প্রথম পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন: শরীর, খাদ্য (পৃ.১—৫০)

২) দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন: পোশাক, ঘরবাড়ি, পরিবার (পৃ.৫১—১১১)

৩) তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন: আকাশ, সম্পদ, সাবধানতা (পৃ.১১২—১৫৪)

প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের জন্য সক্রিয়তামূলক কার্যাবলী	প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নে ব্যবহৃত সূচকসমূহ
১) সারণি পূরণ ২) ছবি বিশ্লেষণ ৩) তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ ৪) দলগত কাজ ও আলোচনা ৫) কর্মপত্র পূরণ ও সমীক্ষার বিবরণ ৭) সঙ্গী মূল্যায়ন ও স্ব-মূল্যায়ন ৮) হাতের কাজ ও মডেল প্রস্তুতি ৯) ক্ষেত্র সমীক্ষা (Field work)	১) অংশগ্রহণ ২) প্রশ্ন ও অনুসন্ধান ৩) ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের সামর্থ্য ৪) সমানুভূতি ও সহযোগিতা ৫) নান্দনিকতা ও সৃষ্টিশীলতার প্রকাশ

প্রশ্নের নমুনা

(এই ধরনের নমুনা অনুসরণ করে পার্বিক মূল্যায়ন প্রশ্নপত্র তৈরি করা যেতে পারে। প্রয়োজনে অন্যান্য ধরনের প্রশ্নও ব্যবহার করা যেতে পারে। কী কী ধরনের প্রশ্ন করা যেতে পারে তার একটি নকশা দেওয়া হলো)

(১) অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

দুধ থেকে নীচের কোন খাবারটি তৈরি হয়?

(ক) রুটি (খ) চানাচুর (গ) ছানা (ঘ) মুড়ি

(২) ঠিক বাক্যের পাশে টিক (✓) দাও ও ভুল বাক্যের পাশে ক্রস (✗) দাও।

(ক) ডাক্তারবাবুদের পোশাক হলো অ্যাপ্রন।

(খ) মুখের লালা খাবার হজম করতে কাজে লাগে না।

(৩) শূন্যস্থান পূরণ করো :

(ক) পুকুরের জল বাষ্প হয়ে ———————— তৈরি করে।

(৪) **বেমানান শব্দটি খুঁজে বার করো :**

ক) চানাচুর, নিমকি, ভাত, চিপস

খ) ধুতি, সালোয়ার, পাঞ্জাবি, বর্ষাতি

গ) আলু, আম, লঙ্কা, আনারস

ঘ) উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, সুকুমার রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যজিৎ রায়

(৫) ক স্তম্ভের সঙ্গে খ স্তম্ভ দাগ দিয়ে মেলাও :

ক স্তম্ভ	খ স্তম্ভ
ক) মায়ের বোন	ক) মেঠো ইঁদুরের বাসা
খ) মাটির নীচে গর্ত	খ) শুক্লপক্ষের প্রথমা
গ) অমাবস্যার পরের দিন	গ) নাড়ির ছন্দ
ঘ) ঝিনুক দিয়ে পুতুল তৈরি	ঘ) ঘরোয়া শিল্প
ঙ) হৃদযন্ত্র	ঙ) মাসিমা / খালা

(৬) **সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন (একটি থেকে দুটি বাক্যে উত্তর দিতে হবে)** : ক) যাযাবর মানুষ কোথায় থাকত? খ) পালং, কচু, পান আর ধানের কোন কোন অংশ আমরা খাই? গ) শীতকালে পশু-পাখিরা ঠান্ডা থেকে কীভাবে রক্ষা পায়? ঘ) আগুনের ব্যবহার জানার পর মানুষের কী কী সুবিধা হলো?

(৭) তোমাকে দিদিমণি একটি কালমেঘ আর একটি বাসক গাছের পাতা দিলেন। তুমি এদের কীভাবে কাজে লাগাতে পারো?

(৮) প্রায়ই তোমার বন্ধুর পায়ের চামড়া ফেটে যায়। তুমি বন্ধুকে কীভাবে পায়ের যত্ন নিতে বলবে?

(৯) **চিহ্ন ব্যবহার করে** তোমার বাড়ির দরজা, জানলা, শোবার ঘর, বারান্দা, আর রাস্তা দেখাও।

(১০) **পার্থক্য দেখাও :** (ক) শশা ও আলু (খ) চোখ ও জিভ (গ) লোম ও পালক (ঘ) টেলার ও ড্রাইভার

(১১) (ক) জলে সাঁতার কাটে এমন একটা জন্তুর **ছবি আঁকো**, (খ) গাছ থেকে গাছে লাফ দিয়ে যায় এমন একটা জন্তুর **ছবি আঁকো**, (গ) গরমকালে খাও এমন একটা ফলের **ছবি আঁকো**, (ঘ) মাটির দেওয়াল ও খড়ের ছাউনি ছাওয়া একটা বাড়ির **ছবি আঁকো**।

(১২) **নিম্নলিখিত শব্দগুলির ওপর ২-৩টি বাক্য লেখো :**

স্কিপিং , সাবান, রক্তাল্পতা, ইন্দ্রিয়, ব্যায়াম, হনুমানের বুদ্ধি, শিম্পাঞ্জি, ডুবোজাহাজ, আনাজ, হজম, বিষফল, আগুন, জাহাজ, শিকার, সুতির পোশাক, পোশাক বোনা, মানচিত্র, টালি, টিন, সিমেন্ট, ইট, জলের পাম্প, ঝড়, বন্যা, তাঁবু, কোমরে ব্যথা, পরিবার, ঠিকানা, পোস্ট-কার্ড, জীবিকা, আকাশের রঙ, ছায়া, সূর্য, চাঁদ, তারা, মেঘ, বৃষ্টি, স্বাস্থ্য, জলপান, ধোঁয়া, শ্বাসকষ্ট, উর্বর মাটি, প্রাকৃতিক সম্পদ, জল, মাটি, পুকুর, বাঁশ, কৃষি সম্পদ, সিগন্যাল, জেব্রা-ক্রসিং, নেলকাটার, ব্লেড, মোমবাতি, ইস্ত্রি, পেরেক, মাটির উনুন, ফুসফুস, হৃদযন্ত্র, নাড়ি, নিশ্বাস, মেডেল, পাহাড়, বিদ্যুৎ, সকাল, সন্ধ্যা, ঘন্টা, কম্পিউটার, পালকি, ফটোকপি, দোকান।

(১৩) এই বইয়ের নিম্নলিখিত পৃষ্ঠার ছবিগুলো শিক্ষার্থীদের দেখান ও ছবির বিষয়ে তিনটি বাক্য লিখতে বলুন :

পৃষ্ঠা সংখ্যা — ৪, ৭, ১৭, ১৯, ২৩, ২৮,৩৫,৩৯, ৪০, ৪৩, ৪৮, ৪৯, ৫৩, ৫৫, ৫৮, ৬০, ৬৫, ৭০, ৭৪, ৭৫, ৮০, ৮৩, ৮৪, ৮৬, ৮৭, ৮৯, ৯৭, ৯৮, ১০০, ১০৩, ১০৬, ১০৯, ১১০, ১১৩, ১১৪, ১২০, ১২৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭, ১৪০, ১৪২, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৯, ১৫২

(১৪) নীচের শব্দ ঝুড়িতে নানাধরনের শব্দ দেওয়া আছে। কাছাকাছি সম্পর্কযুক্ত শব্দগুলিকে তালিকাভুক্ত করো।

নখ মৌমাছি
বাঘ
ডানা শিং
চড়াই
শিম্পাঞ্জি চোখ
ফড়িং
আঁশ পালক
লোম
হরিণ

হাঁড়ি থালা
মাটি আগুন বাসন
কাপ কুমোরের চাকা
পিতল তামা সোনা
লোহা পাথর
চিনেমাটি তির
ধনুক বল্লম লাঠি
ভাঁড় হাঁড়ি

ঢ্যাঁড়শ
ওল টম্যাটো
শশা আলু
লাউ
পেঁয়াজ গাজর
পটল
শিম কড়াইশুঁটি
পুঁই ডাবের জল
খেজুরের রস
পানীয় জল

লুঙ্গি
সোয়েটার
চাদর জামা
টুপি বর্ষাতি
জ্যাকেট অ্যাপ্রন
সোনা
জার্সি চুড়িদার
কোট প্যান্ট গেঞ্জি
শাড়ি
শার্ট ধুতি
পাঞ্জাবি

শিখন পরামর্শ

স্বাগত, বন্ধুরা। আসুন, আমরা সবাই মিলে শিশুদের শেখায় সাহায্য করার পথ খুঁজি।

শিশুরা শৈশব থেকেই শিখছে। পরিবারে, পাড়ায়, নিকট আত্মীয়দের কাছে। অনেক কিছু তারা শুনেছে। কিন্তু ঠিকঠাক বোঝেনি। ধারণা জন্মেছে, কিন্তু তা অসম্পূর্ণ। তাই তাদের কৌতূহল জন্মেছে। এই আবছা ধারণাগুলোকে তাদের জ্ঞানে পরিণত করায় কিছু সাহায্য দরকার। অনেক ক্ষেত্রেই তা এক ধাপে হবে না। তার একেবারে প্রথম ধাপ হোক এই বই।

শিশুরা রোজই তাদের মতো করে নতুন ধারণা গড়ে নিচ্ছে। তারই মধ্যে অল্প হলেও কিছু বিষয়ে তাদের ভুল ধারণা গড়ে উঠেছে। সেগুলো ভুল কিনা তা তারা ভেবে দেখেনি। ভুল-ঠিক বিচার করা না শিখলে তার ভবিষ্যৎ জীবন নানা সংশয়ে জটিল হবে। কীভাবে যুক্তি-তথ্য দিয়ে ধারণা যাচাই করতে হয়, এটা ভাবতেও তাদের সাহায্য দরকার। আমরা তাদের বিশ্বাসে আঘাত না দিয়ে সে বিষয়েও তাদের সাহায্য করার চেষ্টা করতে পারি।

অনেক বিষয়ে শিশুদের কোনো ধারণাই গড়ে ওঠেনি। অথচ তার আগামী জীবন আনন্দময় করতে সেসব বিষয়ের ধারণা জরুরি, জ্ঞান থাকা দরকার। সেই বিষয়গুলো নিয়ে সে ভাবতে শুরু করুক, ধারণা লাভ করা শুরু করুক, এটা আমরা সবাই চাই। কীভাবে তাকে ভাবতে উৎসাহিত করা যায়? এবিষয়ে আমাদের সম্মিলিত ভাবনা উঠে আসা দরকার।

> '...... ছেলে যদি মানুষ করিতে চাই, তবে ছেলেবেলা হইতেই তাহাকে মানুষ করিতে আরম্ভ করিতে হইবে; নতুবা সে ছেলেই থাকিবে, মানুষ হইবে না। শিশুকাল হইতেই, কেবল স্মরণশক্তির উপর সমস্ত ভর না দিয়া, সঙ্গে সঙ্গে যথাপরিমাণে চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তির স্বাধীন পরিচালনার অবসর দিতে হইবে।'
>
> **'শিক্ষার হেরফের', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৮৯২**

আমাদের পরিবেশ

অনুকূল পরিবেশই সভ্যতার ভিত্তি

আজকের শিশু ভবিষ্যতের নাগরিক। তাদের ভাবনায় এই ধারণা স্পষ্ট হওয়া দরকার। এজন্য পরিবেশের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে তাদের জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। কীভাবে বর্তমানের পরিবেশ গড়ে উঠল সে ইতিহাসও জানতে হবে। আগামীদিনে পরিবেশ ভালো রাখার জন্য কী করণীয় তা বুঝতে হবে। সৃষ্টিশীলতার সঙ্গে সেই বোধ প্রয়োগ করতে হবে।

ভূগোল, ইতিহাস, বিজ্ঞান, স্বাস্থ্যশিক্ষা ইত্যাদি নানা বিষয়ে ও পাঠ্যবইতে এই বোধের সমগ্রতাকে ভাঙার একটা প্রথা অনেকদিন থেকে চলছে। কিন্তু শিশুর কাছে তার পরিবেশ একটা সমগ্রতা নিয়ে আসে। তার বর্তমান সেখানে তার অতীত ও আগামীর সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। ইতিহাস মিশে যায় ভূগোলে, পরিবেশ মিশে যায় বিজ্ঞানে। এই মিলমিশের মাঝে রয়েছে শিশুর কৌতূহল মেটানোর অফুরান সম্ভার। সেই কৌতূহলজাত ভাবনাচিন্তা তখনই বলার সুযোগ দরকার। বিষয়ের খণ্ডন তার শিক্ষাকে প্রাণহীন অঙ্গসমষ্টিতে পরিণত করে।

তাই *আমাদের পরিবেশ* বইতে একটা সমগ্রতা রাখার চেষ্টা। নানা বিষয়ে পরিবেশকে ভাঙা হয়নি। শিশুর সীমাহীন কৌতূহলকে বিষয়ভুক্ত বৃত্তের আটকে রাখার থেকে বিরত থাকার সচেতন প্রয়াস হয়েছে। শিশুমনে সবার আগে যে প্রসঙ্গগুলি জরুরি হতে পারে, সেগুলিকে নির্ভর করে তাকে নানা বিষয় নিজে নিজে শেখায় সাহায্য করার চেষ্টা হয়েছে।

‘.... বালক অল্পমাত্রও যেটুকু শিখিবে তখনি তাহা প্রয়োগ করিতে শিখিবে, ... একথায় সায় দিয়া যাইতে অনেকে দ্বিধা করেন না, কিন্তু কাজে লাগাইবার বেলা আপত্তি করেন। তাঁহারা মনে করেন, বালকদিগকে এমন করিয়া শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব। তাঁহারা যাহাকে শিক্ষা বলেন তাহা এমন করিয়া দেওয়া অসম্ভব বটে। তাঁহারা কতকগুলা বিষয় বাঁধিয়া দেন, ...এতটুকু ইতিহাসের অংশ, এতগুলি ভূগোলের পাতা, ... শিশুর মন যতটুকু শিক্ষার উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করিতে পারে অল্প হইলেও সেইটুকু শিক্ষাই শিক্ষা; আর যাহা শিক্ষা নাম ধরিয়া তাহার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া দেয় তাহাকে পড়ানো বলিতে পারো, কিন্তু তাহা শেখানো নহে।.....এই তাড়নায় ও পীড়নে তাহাকে যে কতটা লোকসান দিতে হয়, কি বিপুল মূল্য দিয়া সে যে কত অল্পই ঘরে আনিতে পায়, তাহা কেহ বা বুঝেন না, কেহ বা বুঝেন, স্বীকার করেন না, কেহ বা বুঝেন, স্বীকার করেন, কিন্তু কাজের বেলা যেমন চলিয়া আসিতেছিল তাহাই চালাইতে থাকেন।’

‘আবরণ’, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯০৬

তাড়নাহীন, পীড়নহীন শিক্ষা

খেলা, গল্প, আড়ি-ভাব

আনন্দের আর নেই অভাব

সব কিছুর মধ্যেই শেখার উপকরণ আছে। আর ভালো লাগলেই শেখা সহজ। ভালো লাগার সম্ভাবনাময় কিছু বিষয় আমরা বেছে নিয়েছি।

- খেলা
- নিজেদের মধ্যে আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক
- বাড়ির ও পাড়ার প্রিয়জন ও বড়োদের সঙ্গে গল্প করা

একটু পড়তে পারলে তিনভাবেই শেখায় শিশুরা উৎসাহ পাবে। আপনি (শিক্ষক/শিক্ষিকা) তাদের আরো উৎসাহ দেবেন। প্রতি পৃষ্ঠায় কয়েকজন শিশু ও তাদের শিক্ষিকার আলোচনায় একটা মূল প্রসঙ্গে নানারকমের কয়েকটা কথা আসছে। সেটাই পাঠ্য। পড়লেই মনে হবে যেসব কথা আছে তা পড়ুয়ারা ও আপনি, নিজেরাও বলতে পারতেন। ওই আঙ্গিকেই তারা ছোটো ছোটো দল করে আরো আলোচনা করুক। সেটা বোঝাতেই প্রতিটি কর্মপত্রের আগে ‘দলে করি বলাবলি / তারপরে লিখে ফেলি’ কথাটি বলা আছে।

নিজেদের মধ্যে এই আলোচনা খুব দরকারি। দেখবেন, এই আলোচনায় কে কতটা অংশ নিচ্ছে। অনেক সময় হয়তো এই আলোচনাগুলো ক্লাসে তথাকথিত ভালো-খারাপের বৈপরীত্যে আঘাত করবে। অনেক সময়েই যে ভালো পড়তে পারে বা লিখতে পারে সে হয়তো নতুন কথা বলতে পারে না। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। বইতে ৪৩ পৃষ্ঠার শেষটা দেখুন। এমন হতে পারে যে, রান্না প্রসঙ্গে একজন আর কী লাগবে? আর কী করবে? – সেই নিয়ে আলোচনায় নানা কথা বলছে। অন্য একজন কিছুই জানে না। সে শুনল। এরপর লেখা। এবার দ্বিতীয়জন লিখল। প্রথমজন না দেখে লিখতে পারে না। তারটা দেখে লিখল। এতে ক্ষতি নেই। না দেখা নিয়ে তাড়না ও পীড়ন করলে যা শিখত, এতে দু-জনেই তার চেয়ে অনেক বেশি শিখবে। অভিভাবক /অভিভাবিকাদের বলবেন এদের মধ্যে কে বেশি ভালো তা নিয়ে তুলনা করলে দু-জনেরই ক্ষতি হবে।

শরীর থেকে শুরু, সাবধানতায় শেষ

কোথায় ছিলাম ? কোথায় যাব ? কে আমি ?

শিশুর নিজের আর তার চারপাশের মানুষ ও প্রাণীদের শরীর বিষয়ক নানাকিছু ১ থেকে ২৫ পৃষ্ঠায় শেখার বিষয়। এই অংশে বিজ্ঞান, শারীরবিদ্যা, স্বাস্থ্য, খেলাধুলা, ভূগোল -- পরিবেশের এই বিষয়গুলো মিশে আছে। রঙিন ও আকর্ষক ছবিগুলি শিশুরা দেখবে। কাউকে তার নিজের মতো দেখতে কিনা খুঁজবে। কেউ কেউ ছবিগুলি নিজের মতো করে এঁকে ফেলার চেষ্টা করবে। তাকে উৎসাহ দেবেন। কেউ খেলার মাঠ, পুকুর ইত্যাদি নিয়ে অনেক অন্য কথা বলবে। তাদের চিন্তায়ও উৎসাহ দেবেন। না-মানুষ প্রাণীদের শরীর নিয়ে নানা কথা আছে ১৯ থেকে ২৫ পৃষ্ঠায়। এই অংশে দেখবেন তথাকথিত পিছিয়ে থাকা শিশুদের কেউ কেউ অনেক জানে। তাদের সেই জ্ঞানের প্রশংসা করবেন। তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়বে। *আমিও পারি*— এই বিশ্বাস এসে যাবে। তাহলেই সে যা আগে ভালো পারত না তাও অনেকটা পারবে।

এখানে একটা কথা বিশেষভাবে বলার আছে। বইয়ের বেশি অংশটাই সংলাপধর্মী। ছোটো ছোটো দলে সেগুলি অভিনয় করতে পারে শিশুরা। অভিনয় করলে শেখা খুব ভালো হবে। কীভাবে কথাগুলো বলতে হবে, তা ভাবতে গিয়ে অর্থ ভালো বুঝতে পারবে। নতুন সংলাপ বলতে পারবে। দরকার হলে আপনি ভাষায় সামান্য পরিমার্জন করে দেবেন। স্থানীয় অঞ্চলের বৈচিত্র্যকে ধারণক্ষম এমন সংলাপ বানিয়ে নেবেন। প্রত্যেককে অন্তত একবার করে নাটকে অভিনয় করাবেন।

এরপর খাদ্য-প্রসঙ্গ এসেছে ২৬ থেকে ৫০ পৃষ্ঠায়। এই অংশের প্রথম দিকটায় বিজ্ঞান, শারীরবিদ্যা, স্বাস্থ্য-র সঙ্গে ভূগোল এবং শেষ দিকটায় ইতিহাস বেশি করে এসেছে। ইতিহাসের সব আলোচনাই বর্তমানের প্রসঙ্গ থেকে শুরু করা হয়েছে। বর্তমানে কোনো বিষয় এমন, অতীতে সেটি কেমন হয়ে থাকতে পারে— এ নিয়ে চিন্তা করলে তবেই ইতিহাস সম্পর্কে আগ্রহ হবে। তাই চিন্তার অনেক সূত্র ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে আগুনের ব্যবহার বিষয়ে আলোচনার প্রসঙ্গ আনা যায়। আগুন জ্বালানো যে একটা সমস্যা ৪৩ পৃষ্ঠায় তা বলা হয়েছে। তারপরই বর্তমানে আগুন জ্বালানোর কথা আনা হয়েছে। আগুন জ্বালাতে পারার পর বাসনপত্রের প্রসঙ্গ এসেছে ৪৪ পৃষ্ঠায়। মানুষ কী করে প্রথম আগুন পেল তা এসেছে ৪৮ পৃষ্ঠায়। এভাবে একটু একটু করে চিন্তার সূত্র ধরিয়ে দিতে হয়। তবেই জ্ঞানগঠনের সম্ভাবনা থাকে। একবারে বেশি বলে দিলে চিন্তার সময় থাকে না। আমরা চাই শিশুরা চিন্তা করবে। বাড়িতে, পাড়ায় খোঁজখবর নেবে। নিজেদের আলোচনায় সবাই সেভাবে জেনে আসা কথা বলবে।

চিন্তা করার পর তার প্রয়োগ করতে পারছে কিনা তাও মাঝে মাঝে দেখতে চাওয়া হয়েছে। একটা উদাহরণ: ৩৭-৩৮ পৃষ্ঠায় কথোপকথনে মোটামুটি বলে দেওয়া হয়েছে বিষফল চেনার সম্ভাব্য পদ্ধতি। ৪৮-৪৯ পৃষ্ঠায় প্রাচীনকালে আগুন ব্যবহারের পাশাপাশি পোষ্য পশুদের প্রসঙ্গও এসেছে। এখানে চাওয়া হয়েছে সে নিজে ভাবুক। পশু চিনতেও যে একই ধরনের *করে দেখে শেখার* পদ্ধতি ছাড়া উপায় ছিল না সেটা সে নিজে বলুক। এভাবে তাকে ভাবতে দেওয়াই চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তির স্বাধীন পরিচালনার সুযোগ দেওয়া। দেখবেন, এই পর্বেও সবাই যেন কমপক্ষে একবার করে নাটকে অভিনয় করার সুযোগ পায়। একাধিকবার হলে আরো ভালো।

পোশাক প্রসঙ্গ আছে ৫১ থেকে ৬৪ পৃষ্ঠায়। এই প্রসঙ্গটাকে খানিক ভূগোলকেন্দ্রিক বলে মনে হতে পারে। তবে উপস্থাপনায় পোশাকের অর্থনৈতিক দিক এসেছে ৫৬ থেকে ৫৮ পৃষ্ঠায়। মানুষের শ্রম যে মূল্যবান তা সরাসরি জ্ঞান হিসাবে শেখানোর চেষ্টা না করে শিশুর নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে যাতে শ্রম বিষয়ে তার ধারণা গড়ে ওঠে সেজন্য চেষ্টা করা হয়েছে। পোশাকের ইতিহাস এসেছে ৫৯ থেকে ৬২ পৃষ্ঠায়। এখানেও শিশুর নানা অভিজ্ঞতা নিয়ে কথা প্রসঙ্গে আশ্চর্য হয়ে যাওয়ার মতো কয়েকটা তথ্য জানানো হয়েছে। কিন্তু আসল কথা তাকে চিন্তার খোরাক দেওয়া। পোশাক প্রসঙ্গ শেষ করা হয়েছে ৬২-৬৩ পৃষ্ঠায় না-মানুষদের পোশাকের কথা দিয়ে। দেখবেন, নাটক যেন এই পর্বেও হয়।

পরের প্রসঙ্গ ঘরবাড়ি। ৬৫ থেকে ৯০ পৃষ্ঠায়। এখানে প্রধান নতুন বিষয় চিত্র আর মানচিত্রের পার্থক্য সম্পর্কে ধারণা গঠন। তারপর মানচিত্র দেখা ও বোঝা। তারপর নিজে আঁকা। এই কাজে মজা পেলে শিশুর ভূগোল শেখার ভিত অনেক মজবুত হবে। এখানেও বাড়ির দাম নির্ধারণের নানা কথা আছে। ঘরবাড়ির বিবর্তনের ইতিহাসও ছুঁয়ে যাওয়া হয়েছে। আগের মতোই, একই ধারায়। না-মানুষদের ঘরবাড়ি বাদ দিলে পরিবেশের সামগ্রিকতার অঙ্গহানি হতো। তাই সেটাও আছে ৮৯-৯০ পৃষ্ঠায়। এই পর্যন্ত পৌঁছে অনেকেই হয়তো উৎসাহী হয়ে দাবি করবে নাটকের। আপনি অন্যদেরও উৎসাহ দেবেন তাতে যোগ দিতে।

এবার পরিবার-এর কথা। ৯১ থেকে ১১১ পৃষ্ঠায়। এখানে পরিবারের শাখা-প্রশাখা, পরিবারে সবার পারস্পরিক সহযোগিতা, ঠিকানা, জীবিকার কথা এসেছে। এখানে এবং আগেও কিছু বিষয়ে শিশুকে নিজস্ব মতামত গঠন করতে বলা হয়েছে। কোন মতটা ঠিক তা নিয়ে কিছু বলা হয়নি। দেখবেন, কোনো পক্ষপাত যেন প্রকাশ না পায়। নানা পরিস্থিতির কথা আসুক। কচিকাঁচারা নিজেরা এসব নিয়ে ভাবুক। মত চাপিয়ে দেওয়া স্বাধীন শিক্ষার পক্ষে ভালো নয়। আগে শেখা ধারণা প্রয়োগ করার অনেক প্রসঙ্গ আছে এখানেও। ইতিহাস ও ভূগোল নানাভাবে মিশে গেছে। না-মানুষদের পরিবারের ধারণাও আছে। মানুষ ও না-মানুষ মিলেমিশে নানান অভিনয়যোগ্য উপাদান এখানেও আছে। যথাযথভাবে তা ব্যবহৃত হবে এই আশা রাখা হলো।

এরপর ১১২ থেকে ১৩০ পৃষ্ঠায় এসেছে আকাশের প্রসঙ্গ। সূর্য, চাঁদ, মেঘ,বৃষ্টি, বজ্রপাত, রামধনু, দিগন্তরেখার কথা এসেছে। এখানে ভৌতবিজ্ঞানই মুখ্য। তবে প্রায় সবসময়েই তা এসেছে সমাজ ও পরিবেশের প্রসঙ্গ ধরে। তাই ভূগোলও বাদ যায়নি। সূর্য ও চাঁদ নিয়ে নিরীক্ষণের যে কাজের কথা বলা আছে সেটা বাস্তবে করতে সবাইকে উৎসাহ দেবেন। অনেক দিন ধরে করুক। মাঝে মাঝে মনে করিয়ে দেবেন। শেষের দিকটা নিয়ে অভিনয় করার উদ্যোগ নিতে উৎসাহ দেবেন। শিশুদের নতুন সংলাপ বানানোয় উৎসাহ দিন।

পরের বিষয় সম্পদ। ১৩১ থেকে ১৪৬ পৃষ্ঠা। আগে শরীর প্রসঙ্গে যা শিখেছে তা এখানে প্রয়োগ করবে। জল, বায়ু, মাটি ও আকাশ সবমিলিয়ে প্রকৃতি বিষয়েও সচেতন হবে। মানুষের সৃষ্টি করা সম্পদ বিষয়েও প্রাথমিক ধারণা পাবে। অনেক বিষয় এখানে পরস্পর সংযুক্ত হয়ে আছে। এখানেও অভিনয়ের হরেক উপাদান আছে। পাশাপাশি রয়েছে বিশাল প্রকৃতির নানান বিস্ময় ও রহস্যের হাতছানি। শিশুরা আরো বেশি করে প্রকৃতির সান্নিধ্যে যাক, শিখুক প্রকৃতির থেকে। তাদের মন-প্রাণ সজীব হয়ে উঠুক এটাই কাম্য। জল-মাটি-গাছপালার স্পর্শ লাভ করুক তারা।

শেষ প্রসঙ্গ দৈনন্দিন সাবধানতা। ১৪৭ থেকে ১৫৪ পৃষ্ঠায়। সাবধানে শহর-নগরের রাস্তা পার হওয়াও যেমন আছে, সাবধানে কোদাল চালানোর কথাও আছে। তেমনই শিশুকে ক্রমে স্বনির্ভর হতেও উৎসাহ দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। শেষ পর্বে বিপন্ন বন্ধুর পাশে দাঁড়ানোর বার্তা আছে।

১৫৫-১৫৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে রংবাহার— তাতে আছে পাঁচটি ছবি। নিজেদের চারপাশকে নানা রঙে দেখে শিশুরা। সেইসব রঙেই তারা রঙিন করে তুলুক ছবিগুলো।

১৬১-১৬২ পৃষ্ঠায় মূল্যায়নের রূপরেখা দেওয়া হলো।

বইয়ের প্রতিটি পৃষ্ঠায় কর্মপত্র রয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা ওই কাজগুলো কীভাবে সম্পন্ন করছে আপনি সেগুলি নথিভুক্ত করুন। এবং তার ভিত্তিতে পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীদের অতিরিক্ত এবং প্রয়োজনীয় সাহায্য করুন। এভাবেই হতে পারে শিক্ষার্থীর নিরবচ্ছিন্ন সামগ্রিক মূল্যায়ন (CCE)।

শিক্ষার্থীদের বিভিন্নরকম পারদর্শিতা বুঝতে প্রতিটি পাঠের পর দেওয়া কর্মপত্র নানাভাবে আপনার কাজে লাগবে। শিশুরা আলোচনায় ও পরীক্ষা করায় কীভাবে অংশ নিচ্ছে দেখবেন। কে কী লিখছে দেখবেন। কারোর লেখা ভুল বলবেন না। তবে যা দেখছেন সে বিষয়ের তথ্য আপনি সংরক্ষণ করবেন। কীভাবে সংরক্ষণ করবেন তা আপনারা ভাবুন। নিজের স্কুলের ও বিভিন্ন প্রতিবেশী স্কুলের সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করুন। প্রথমে পারদর্শিতার কয়েকটি ক্ষেত্র বেছে নিন। সেই বিষয়গুলিতে শিক্ষার্থীর সামর্থ্য পর্যবেক্ষণ ও সংরক্ষণে অভ্যস্ত হওয়ার পর আরো কয়েকটি ক্ষেত্র বেছে নিন। এভাবে আপনাদের পর্যবেক্ষণ সংবলিত যে নথি তৈরি হবে তা শিক্ষার নতুন দিগন্ত খুলে দেবে।